স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্র আদর্শের পর্যালোচনা

এম. ফিল. (বাংলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক – মিমি মণ্ডল

ক্রমিক সংখ্যা – ০০১৭০০১০৩০০৭

রেজিস্ট্রেশন নম্বর – ১১০৯৬৫ (২০১০-১১)

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা – MPBE194007

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

মে, ২০১৯

This is to certify that the following papers continue original research on "স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্র আদর্শের পর্যালোচনা" by Mimi Mandal to be submitted in order to fulfill partial requirement of degree of M.Phil (Bengali). I further certify that neither this dissertation nor a part of it has been submitted in any other University for any diploma or degree.

Head	Supervisor
Dept. of Bengali	Dept. of Bengali
Jadavpur University	Jadavpur University

মুখবন্ধ

একসময় কেবল স্মৃতিকথা বিষয় বই পড়তে ভালো লাগে বলেই পড়তাম। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আরও বেশি করে জানবার আশায় পড়তে শুরু করি শান্তিনিকেতন বিষয়ক স্মৃতিকথাগুলি। বেশ ভালো লাগতে থাকে অনেক অজান মজার মজার নতুন তথ্য জানতে পেরে। এক একজন এক এক ভাবে দেখেছেন শান্তিনিকেতনকে। বেশীরভাগ মানুষই তাঁদের স্মৃতিকথার নামের সঙ্গে 'আমাদের' কথাটি যুক্ত করতে পেরে নিশ্চয়ই মানসিক আনন্দ পেয়েছেন। আমরা যারা সেই সময়কে কোনও দিনই ছুঁতে পারব না, তাদের জন্য এই স্মৃতিকথাগুলি কেবল আভাস বয়ে আনবে। তাই বা কম কি, একদম কিছু না পাওয়ার থেকে সামান্য কিছু পাওয়াও লাভের। ভালো কিছু পড়লে জানলে তা সবাইকে জানাতেও ইচ্ছে করে। তাই গবেষণার বিষয় ভাবতে দিয়ে এই বিষয়টাই মাথায় এল। তারপর এটা নিয়ে কি ধরণের কাজ করা যায় সে ব্যপারে আলোচনা করলাম অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ মহাশয় এবং অধ্যাপিকা গোপা দত্ত মহাশয়ার সঙ্গে। বিভাগীয় আলোচনায় বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল এবং অধ্যাপক পার্থসারথি ভৌমিক ভুলগুলি ধরিয়ে দিলেন, তারপর সিদ্ধান্ত হল গবেষণা অভিসন্দর্ভের নাম হবে "স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্র আদর্শের পর্যালোচনা"।

এই কাজ করতে গিয়ে যাঁদের আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা গোপা দত্ত মহাশয়া, বই সংগ্রহ করা থেকে ত্রুটি সংশোধন প্রতিটি পদক্ষেপে তার সাহায্য পেয়েছি। বিভিন্ন সময় খুঁটিনাটি বিষয়ে তার সচেতন দৃষ্টি বড় ভুল হবার আগেই তা শুধরে নিতে সাহায্য করেছে। নানা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সমস্যায় পরে অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ মহাশয়ের কাছে যখন তখন গেছি, তিনি হাসি মুখে সব শুনেছেন, কখন সেগুলি ছোট করে দেখেননি বা রাগ করেননি। আর বিভাগীয় গ্রন্থাগারের আইভি দি ও হরিশদার কথা না বললেই নয়। তাঁরা সাহায্য না করলে ঐ বইয়ের সাগরে কোনও কিছু খুঁজেই পেতাম না। সব শেষে আমার ঘর ও বাইরের বন্ধুরা যাদের অনেক সহায়তা পেয়েছি, তাঁদের কথা কিছুতেই ভোলা যাবে না। এই কাজে সাহায্য পেয়েছি অথচ ভুলে যাচ্ছি যাঁদের, তাঁদের সকলকে সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই।

মিমি মণ্ডল

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার ইতিহাস	৫
ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র জীবনাদর্শের যাত্রাপথ	১৭
শান্তিনিকেতনের বিস্তারে শ্রীনিকেতন	৩৪
আশ্রমবাসী মানুষদের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩
আশ্রমবাসী মানুষদের স্মৃতিকথায় শিক্ষকবৃন্দ	৫৯
স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা-আদর্শ ও আনন্দলোক	৭৩
শেষের কথা	৯২
গ্রন্থপঞ্জি	১০০

স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্র আদর্শের পর্যালোচনা

এম. ফিল. (বাংলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক – মিমি মণ্ডল

ক্রমিক সংখ্যা – ০০১৭০০১০৩০০৭

রেজিস্ট্রেশন নম্বর – ১১০৯৬৫ (২০১০-১১)

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা – MPBE194007

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

মে, ২০১৯

ভূমিকা

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি বহু মানুষের স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে। কেউ লিখেছেন তাঁদের শিক্ষার স্মৃতিকথা, কেউ লিখেছেন সেখানকার পরিবেশের স্মৃতিকথা, কেউ লিখেছেন শান্তিনিকেতনের আদর্শের কথা, আবার অনেক মানুষ লিখেছেন শান্তিনিকেতন ভ্রমনের স্মৃতিকথা। লিখেছেন বললে হয়তো ভুল বলা হবে কারণ এখনও অনেক মানুষ শান্তিনিকেতন নিয়ে স্মৃতিকথা লিখছেন, আর আমাদের বিশ্বাস আগামী দিনেও আরও অনেক মানুষ শান্তিনিকেতন নিয়ে স্মৃতিকথা লিখবেন। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন কোন বিশ্বাসে বলছি এ কথা? তাহলে উত্তরটা হল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকে মানুষ যত দিন মনে রাখবেন ততদিন সকলের মনে শান্তিনিকেতন নিয়ে একটা রোম্যান্টিক ভাবনা থাকবেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বোধ হয় এমন একজন সার্থক মানুষ যিনি সারা জীবন একই সঙ্গে ভাব-জগত ও বাস্তব-জগতকে সমান তালে মিলিয়ে চলতে পেরেছিলেন। যিনি এতো বড় কবি তিনিই আবার বিশ্বভারতীর মত প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভালোবাসেন তাঁকে জানতে চান, শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা তাঁদের কাছে সবসময়ই সুখপাঠ্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে শান্তিনিকেতনের সমস্ত স্মৃতিকথা নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। কেবল সেই সময়টুকুর স্মৃতিকথা নিয়ে কাজ যখন শান্তিনিকেতনে সবকিছুই ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঘিরে। সেই সময়ের স্মৃতিকথাগুলি থেকে আমারা বোঝবার চেষ্টা করবো সময়ের বিবর্তন ও আদর্শের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রম কিভাবে বিশ্বভারতী হয়ে উঠল।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা কোন মানুষগুলিকে সঙ্গে নিয়ে হল, আশ্রম বিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতী হয়ে ওঠার পিছনে কোন কোন শিক্ষকগণের অবদান ছিল, কোন কোন মানুষজন সর্ব মোহ ত্যাগ করে বিশ্বভারতীর মহৎ উদ্দ্যেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়ক হলেন ইত্যাদি। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিভিন্ন মানুষজন নানা ভঙ্গিতে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন এই সব স্মৃতিকথাগুলি, যার মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে শান্তিনিকেতনের একটি রূপ। সেই স্মৃতিকথাগুলি ভেঙে ভেঙে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক যেভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বিশ্বভারতীতে উন্নীত করতে চেয়েছিলে তার কতখানি সত্যি সত্যি বাস্তব রূপ লাভ করতে পেরেছিল।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে স্মৃতিকথা আর ইতিহাস কিন্তু এক নয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির শুরুতেই সে কথা বলেছেন-"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।...যাহাকিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয়, কত কি রাখে। কত বড়োকে ছোট করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিস কে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।" এই স্মৃতিগুলি যতটানা প্রমাণ যোগ্য তার চেয়ে অনেক বেশি অনুভবের। তাতে সব তথ্য সঠিক হয়না কারণ তার সঙ্গে মনের যোগ অত্যন্ত গভীর। যেখানে প্রয়োজন আর দেনা পাওনার পালা শেষ হয় সেখান থেকেই শুরু হয় স্মৃতির। তাই তার প্রামান্য সত্য হবার দায় থাকে না। কবির কথায়-"জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে...তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।" স্মৃতিকথায় কেবল স্থান-কালের তারতম্য ঘটে তাই নয়, অনেক সময় পাত্রও পরিবর্তিত

হয়ে যায়। সে কারণে স্মৃতিকথাকে তথ্য হিসাবে উপস্থাপন করতে হলে বার বার যাচাই করে নিতে হয়, অনেকের স্মৃতিকথা পড়ে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। যেমন শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের 'ঊর্মিমর্মর' অংশে লিখেছেন-"...সকল ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা লুকাইয়া আছে। যেখানে স্মৃতি নাই সেখানে ইতিহাস নাই।" সেভাবেই স্মৃতিকথা থেকে খুঁজে নিতে হয় ইতিহাস। তবে শুধুমাত্র ভালোলাগার জন্য পড়তে চাইলে অত ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন নেই, তখন রসাস্বাদনটাই আসল কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানতেন ডিগ্রী লাভের জন্য শিক্ষা দেবার মতন বিদ্যালয় ভারতে অনেক আছে। কিন্তু যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চরিত্রও গঠন করতে পারে এমন বিদ্যালয় বিরল। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ 'বিদ্যা উৎপাদন' আর গৌণ কাজ হল 'বিদ্যা দান' কিন্তু ক্ষেত্রে গৌণ কাজটাই একমাত্র কাজ হয়েগেছে। তিনি যে আদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার তত্ত্বগত ধারণা তাঁর শিক্ষামূলক প্রবন্ধগুলিতে আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তবায়ন কতদুর সম্ভব হয়েছিল তা বোঝা যায় শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের স্মৃতিকথা পড়লে। তাঁরা শান্তিনিকেতনকে শিক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে নয়, দেখেছেন নিজেরই আর একটা বাড়ী হিসেবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্বিশেষে সকলে থেকেছেন একই পরিবারের মতো করে, একই আত্মার আত্মীয় হয়ে। সেই স্মৃতিকথা গুলির উপর ভিত্তি করেই আমাদের এই গবেষণার সূত্রপাত। প্রবন্ধে লিখেছিলেন বিশ্বভারতীকে তিনি এমন বিদ্যা ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে চান যেখানে দেশবিদেশের মনীষীগণকে তিনি আহ্বান জানাবেন, যাঁরা নিজের শক্তি ও সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করবেন, নতুন সৃষ্টি করবেন। তাঁদের জ্ঞান মিলিত হলে আপনা থেকেই সে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। শান্তিনিকেতনের

স্মৃতিকথা গুলি পড়লে বোঝা যায় তিনি সত্যিই এমন বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীরা প্রায় প্রত্যেকে পরবর্তী জীবনে এক-একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি হবে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানতেন না। কেবল জানতেন এই আশ্রম বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে তাঁরা সংসারের নানা জটিলতার মাঝে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ এখানকার বাহুল্য বর্জিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যাঁরা একবার নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন সাংসারিক কঠিন অবস্থায়ও তাঁরা মিনিয়ে চলতে পারবেন। কারণ তাঁদের প্রতিভার বিকাশের সর্বত মাধ্যম তিনি গড়ে দিতে পেরেছিলেন বিশ্বভারতীর পরিবেশের মধ্যেই। রবীন্দ্র আদর্শে কল্পিত শান্তিনিকেতন ও তিলে তিলে গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতনকে প্রত্যক্ষ করেছেন যে মানুষজন তাঁদের স্মৃতিকথা সম্বল করে শান্তিনিকেতনকে আরও একটু জানার আগ্রহে এই গবেষণা।

শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার ইতিহাস

‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে অনেক স্মৃতিকথাই বলেছেন। পরবর্তী সময়ে গবেষকগণ শান্তিনিকেতনের ইতিহাস সন্ধান করতে সেই সূত্রগুলি ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিভাবে এই স্থানের সন্ধান পেলেন সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন- “বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতি প্রাচীন যুগল ছাতিম গাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিলনা। ...একদা এই দুটি মাত্র ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূর পথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে ঐ দুটি ছাতিম গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁছেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন।”[১] রবিন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই তথ্য বিশ্লেষণ করে এই যাত্রা পথের একটি বিস্তারিত ও গ্রহণযোগ্য পথ নির্দেশ দিয়েছেন- “দেবেন্দ্রনাথ কোন্ সময়ে কোন্ পথে বোলপুর আসেন তাহা এক সমস্যা হইয়া আছে। লুপলাইনের রেলচলাচল ১৮৬০ সালের পূর্বে হয় নাই মনে হয়। কারণ অজয় সেতু হইতে সাঁইথিয়া পর্যন্ত রেলপথ ১৮৫৯ সালের ৩রা অক্টোবর খোলা হয়।” ...“হিমালয় হইতে নামিয়া আসিবার পর দেবেন্দ্রনাথ রায়পুর আসেন; আমাদের মনে হয় নৌকাযোগে ভাগীরথী দিয়ে কাটোয়া হইয়া গুনটিয়ার ঘাটে নামেন ও সেখান হইতে পালকী-পথে রায়পুর আসেন। চিপ্

সাহেব নির্মিত সুরুল-গুনটিয়া রাস্তার পাশেই বর্তমান শান্তিনিকেতন ও ছাতিম গাছ দুটি পড়ে। বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুর যাইতে শান্তিনিকেতন পথে পড়ে না"[২] রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে যে তাঁর ১৮৫৯ সালের ৩রা অক্টোবরের আগেই আলাপ হয়েছে সে কথা তিনি ১৮৫৯ সালের ২৭ জুলাই চিঠিতে জানাচ্ছেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে–"তুমি শুনিয়া অবশ্য আহ্লাদিত হইবে যে বীরভূম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।"[৩]

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে যে পথ নির্দেশ পাওয়া যায় তাও খানিকটা ঐ রকম–'রায়পুরে আসার আগে মহর্ষিদেব গুসকরায় তাঁবুতে বাস করে গিয়েছিলেন। তিনি নির্জন জায়গা খুঁজছিলেন। অল্প দিনের ব্যবধানে তিনি দু'বার রায়পুরে আগমন করেন এবং তারপর এ জায়গা পাট্টা নেওয়া হয়।'[৪] আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথার সূত্র ধরেই অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন-'শান্তিনিকেতন আবিষ্কারের ইতিহাসটি এই : রায়পুরের সিংহ-পরিবারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। একদিন সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুরের পথে শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়ায় তিনি ক্ষণকালের মতো দাঁড়াইলেন।...এই জায়গাটি হঠাৎ তাঁহার মনকে টানিল।'[৫] কিন্তু 'বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুরের পথে শান্তিনিকেতনের' পড়বার কথা নয়, সে কথা তথ্য সহ প্রমথনাথ বিশী প্রমাণ করেছেন। "বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুর যাইবার পাকা সড়ক আছে-এই সড়ক ধরিয়া রায়পুর গেলে পথে শান্তিনিকেতনের মাঠ পড়িবার কথা নয়। তবে মহর্ষির পথে এই মাঠ পড়িল কেমন করিয়া? আমার বিশ্বাস কোন একবার পশ্চিম হইতে ফিরিবার সময়ে মহর্ষি দেব আহম্মদপুর স্টেশনে নামিয়া রায়পুর যাইতেছিলেন। সিউরি হইতে

বোলপুর হইয়া রায়পুর যাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া চললে পথে শান্তিনিকেতনের মাঠ অতিক্রম করিতে হয়।"[৬]

আসলে স্মৃতিকথাকে আশ্রয় করে ইতিহাস লিখতে গিয়েই যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাতিমতলায় আশ্রয় নেওয়া বা শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছনোর এই যে স্মৃতিকথা, যা বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় উঠে এসেছে তাতে বেশ কিছু ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে। যা পরবর্তী সময়ে প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মতো গবেষকগণ তুলে ধরেছেন। বর্তমান সময়ে পুঁথি ও দলিল অনুসন্ধান করে বুদ্ধদেব আচার্য এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন–"সুরুলের নথিতে (অপ্রকাশিত) আমরা এইদিকে রেলপথ বসানোর সন তারিখ পেয়েছি। রেলওয়ে কমিশনের কমিশনারের পত্রে জমি অধিগ্রহণের নোটিসে সন তারিখ আছে তা থেকে বোঝা যায় তখন এদিকে গুসকরা পর্যন্ত রেলপথ বসেনি। বর্ধমান রাজবাড়ী থেকে পাল্কিতে করে সোজা সড়ক পথে এসে মহর্ষির তাঁবু পড়তে লাগল গুসকরার রমণার আমবাগানে। চোঙ্গদার মহাশয়গণের সৌধস্থিত পালকিশালায় সম্ভবত ষোলো কাহারের সে পালকির নিদর্শন এখনও রক্ষিত আছে।" [৭]

শান্তিনিকেতনের সূচনা শুনলেই যেমন দু'টি 'ছাতিম গাছ'-এর কথা মনে পড়ে তেমনিই মনে পড়ে 'ডাকাত দলের সর্দার' ও 'বামাচারী তান্ত্রিকের' কথাও। কারণ শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের সঙ্গে এগুলি প্রায় অতপ্রত ভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন-"তখন শান্তিনিকেতনে একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী এককালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক।" অসিতকুমার হালদার তাঁর 'রবিতীর্থে' লিখেছেন-"মহর্ষি এই পবিত্র স্থান কিভাবে আবিষ্কার করেন তার বিষয়

যা' শুনেছি তাই লিখচি। লর্ড সিংহের বাড়ী...নিমন্ত্রিত হয়ে বোলপুর স্টেশন থেকে পাল্কি চড়ে যাচ্ছিলেন রায়পুরে। পথে ভুবনডাঙার কূর্ম-পৃষ্ট ভূমির কাছে যখন গেছেন তখন সন্ধ্যে হয়েছে। ধূ ধূ করচে...মাঠ—একটি শালবনের পশ্চিম প্রান্তে ছাতিম গাছের তলায় পাল্কি নামাতে বল্লেন উপাসন করবেন মহর্ষি। তিনি ছাতিম গাছের তলায় অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ রেখে আসন বিছিয়ে উপাসনায় বসেচেন, অমনি ডাকাতের দল এসে আক্রমণ করলে। পাল্কিবেহারার এবং অন্যান্য বরকন্দাজ লোকজন ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে মহর্ষিকে ফেলে পালাল। ধ্যানমগ্ন আবস্থায় ডাকাতেরা মহর্ষিকে দেখে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে রইল। অস্তগামী সূর্যের রক্তাভায় রঞ্জিত হয়ে তাঁর তখন যে অনুপম রূপজ্যোতি ফুটে উঠেছিল, দেখে ডাকাতদের মন দ্রবীভূত হল। মহর্ষির ধ্যান ভাঙলে তাঁদের দেখে বল্লেন 'আমি এই স্থানটিতে প্রাণের আরাম—আত্মার শান্তি এবং মনের আনন্দ পেয়েছি। তোমরা বল এখন কি চাও?' ডাকাতের সর্দার শুনে বল্লে, 'হুজুর আপনার সেবা করতে চাই-আপনি এখানেই এসে থাকুন।' এই সর্দার শেষে আশ্রমের পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন।"[৮]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় এরই পুনরাবৃত্তি করেছেন আসল ঘটনা অনুসন্ধান করেননি। "শান্তিনিকেতনের সামনে ভুবনডাঙা গ্রাম, সে গ্রাম থাকিত এক ডাকাতের দল।...চারিদিক জনশূন্য। ডাকাতির পক্ষে এমন উপযুক্ত জায়গা আর কি হইতে পারে। কত লোককে যে তাহারা খুন করিয়া ঐ ছাতিম গাছের তলায় তাহাদিগের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দার ধরা দিল; ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিল।"[৯] কিন্তু এ তথ্যেও গলদ আছে বলে প্রমাণ দেখিয়েছেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

কথায়-"...আমি বোলপুরে বাস করিতাম। ভুবনডাঙ্গার ন্যায় ক্ষুদ্র পল্লীতে ডাকাইতদলের বাস ছিল শুনি নাই। গ্রামও বেশি দিনের নহে। নামেই তাহার পরিচয়। প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের দুর্বৃত্ত লোকে পথিকদিগের প্রতি দস্যুতা করিত ইহা সম্ভবপর। জনশূন্য মাঠে ডাকাতি হয় না, রাহাজানি হয়। আর দ্বারিক সর্দার 'ডাকাত দলের সর্দার' রূপে ধরা দেয় নাই। চাকুরি করিতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাস করিয়াছিল। সুতরাং অজিতবাবুর উক্তি ভ্রমাত্মক।"[১০] অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেওয়া তথ্য ও যুক্তি অবশ্যই বেশি গ্রহণযোগ্য, যেহেতু তিনি আশ্রমের সূচনা পর্ব থেকেই ওখানকার কাজকর্মের সঙ্গে আচার্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ১৩৩৫-৩৬ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত স্মৃতির ভুলেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের আলোচনায় যে 'ডাকাত দলের নায়ক'এর কথা বারবার ফিরে আসছে তিনি 'দ্বারিক সর্দার' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি আদতেই ডাকাত ছিলেন না। তিনি মানকরের জমিদার বাড়িতে সর্দারের কাজ করতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে বসবাসের সময় সেখানে একবার ডাকাত পড়ে। তখন তিনি আশ্রমের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে 'দস্যুদলের অবস্থাভিজ্ঞ একজন উপযুক্ত' দারোয়ানের খোঁজ করছিলেন। যোগাযোগ সূত্রে একথা জানতে পেরে মানকরের জমিদার হিতলাল মিশ্র মহাশয় মহর্ষির কাছে 'একজন দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ লাঠিয়ালকে' পাঠিয়ে দেন, এই লাঠিয়ালই হলেন 'দ্বারিক সর্দার'। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-"অনুসন্ধানে জানা যায় যে দ্বারিক সর্দার পূর্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী নামক প্রসিদ্ধ গ্রামের লোক ছিল।...এ পরিবারের কেউ ডাকাত ছিল এরূপ শোনা যায় না।"[১১]

এ কথা প্রমাণিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় যে 'দ্বারিক সর্দার' কোনও ভাবেই ডাকাতের দলের সর্দার ছিলেন না। কারণ স্মৃতির ভ্রমে সুরক্ষা কর্মীকেই ডাকাত হিসাবে প্রতিপন্ন করলে তা যতই রোমান্টিক মনে হোক, তাঁর বংশানুক্রমিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা মোটেই সুখকর নয়।

আমরা সকলেই জানি ঠাকুরমার মৃত্যু শয্যার পাশে বসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল। এরপর থেকে তাঁর জীবন সাধনার ধারাই পালটে গিয়েছিল। তিনি নানা স্থান ঘুরে ঘুরে নিজের একান্ত সাধনার একটি নির্জন স্থান সন্ধান করছিলেন। ঠিক তখনই শান্তিনিকেতনের এই 'দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে'র সন্ধান তিনি পান। তাঁর জীবনের এই শেষ পর্বে এসে সামাজিক জীবনের সঙ্গে প্রায় কোনও যোগই তিনি রাখতে চাইছিলেন না। এ সময়টি তাঁর "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি"র জীবনের ইতিহাস; এ অন্তরঙ্গ জীবনে একের সঙ্গে একের, স্তব্ধের সঙ্গে স্তব্ধের নিত্যনব মিলন-লীলা।"... তাঁর "সাধনার পথ ছিল ধ্যানের পথ। ধ্যান মানে একটি নিবিড় অধ্যাত্ম নিবিষ্টতা, জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে একটি সব চৈতন্য ডোবানো তন্ময়তা।"[১২] তাঁর এই 'ধ্যানপরায়ণতা' সে সময় সর্বজন বিদিত গল্প হয়ে উঠেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন- "আচার্য কেশবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি তিনি একবার মহর্ষির সহিত নৌকা যোগে পদ্মা নদীতে যাইতেছিলেন। একদিন দেখিলেন, মহর্ষি প্রাতে প্রাতরাশের পর নৌকা হইতে বাহির হইয়া নৌকার ছাদে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া নদী দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইতে লাগিল,... মহর্ষির সে জ্ঞান নাই; অবশেষে অপরাহ্ণে চক্ষু খুলিলেন,"।[১৩] তাঁর এই স্বভাবসিদ্ধ অবস্থার জন্য তিনি বেশিক্ষণ মানুষের ভিড়ে থাকতে পারতেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তিনি সে সময় 'তান্ত্রিক সাধকদের মত' সাধনার জন্য

একটি নির্জন স্থান অন্বেষণ করছিলেন। এ কথা জানতে পেরে তাঁর 'সখা ও শিষ্য' মহাতাবচন্দ্র মহর্ষিকে গুসকরার চোঙ্গদার মহাশয়গণের কাছে আসার পরামর্শ দেন, কারণ পঞ্চমুণ্ডির সাধক তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদার তখন গুসকরার জমিদার। তিনি মহর্ষিকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' তৈরির পরিকল্পনা এইখান থেকেই শুরু হয়েছিল। "যে জায়গা ছিল বিষম ভয়ের জায়গা, তাহাই হইল আশ্রয়ের জায়গা-আশ্রম।"[১৪] ভবনডাঙ্গার মাঠের 'বিষম ভয়ের জায়গা'য় পরিণত হবার দুটি কারণ ছিল, একটি ডাকাতি, যা নিয়ে আলোচনা হল। অন্যটি হল ছাতিমতলার 'বামাচারী তান্ত্রিকের' কাহিনী। এরপর সেই আলোচনায় আসা যাক, মহর্ষির শান্তিনিকেতন সন্ধানের অনেক আগে থেকেই ভুবনডাঙ্গার এই অংশে বীরভূমের সাধন পরম্পরার বিশিষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। সে কথা অনেকে না মানলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেষ্ট বলিষ্ঠ ভাবে সে কথা জানিয়েছেন-'বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায়নি তা আমি বিশ্বাস করিনে।'[১৫] তাঁর এ ধারণা যে সত্য অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় তার প্রমাণ আছে "মহর্ষির মুখে শুনিয়াছি বেদি প্রস্তুতের জন্য এই স্থান খনন করিবার সময় অনেক নরমুণ্ডাস্থি পাওয়া গিয়েছিল।"[১৬] কিন্তু ঐ ছাতিম গাছের তলায় নরমুণ্ড ছাড়া বাকি দেহাংশের কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী ছাতিম গাছ এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্যই বলা যায়। আশ্রম থেকে কয়েক মাইল দূরে কঙ্কালীতলা হল বামাচারী তান্ত্রিকদের সাধন ক্ষেত্র, তারও কয়েক মাইল দূরে লাভপুরেও একটি সাধন ক্ষেত্র আছে। তাছাড়া ছাতিম গাছ বা সপ্তপর্ণ বৃক্ষ তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে 'দেববৃক্ষ' বা 'শক্তিবৃক্ষ' নামেও পরিচিত, তথ্য অনুযায়ী তান্ত্রিকের সাধনার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারত থেকে এটি এখানে এনেছিল।

ইত্যাদি তথ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাতিমতলা সত্যি সত্যিই তান্ত্রিকদের আখড়া ছিল।

মহর্ষির জীবনে ও বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এই সপ্তপর্ণ বৃক্ষ দুটি 'বোধিবৃক্ষ' রূপে স্থান পেয়েছে। শান্তিনিকেতন সাধন ক্ষেত্র ছিল, সাধন ক্ষেত্র হয়েই রইল কেবল উন্মেষ ঘটল অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোয়, তন্ত্র থেকে শিক্ষাতন্ত্রে। শান্তিনিকেতনের উদার শিক্ষার পরিবেশে "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে" ঋষি প্রদত্ত এই বানীর সার্থক প্রকাশ ঘটেছে ঐ সপ্তপর্ণ বৃক্ষের সূত্র ধরেই, সে কথা কিছুতেই ভোলা যায় না। শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্নাতকদের শংসাপত্রের সঙ্গে ছাতিম পাতা দানের প্রথা প্রচলিত আছে।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাস মহর্ষির ভুবনডাঙ্গায় আসার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। তাই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছেন এ কথা সঠিক নয়। সন তারিখের তথ্য বিচার করলে দেখা যাবে শান্তিনিকেতনের পত্তন হয়েছিল ১২৬৯ বঙ্গাব্দে ১৮ ফাল্গুন। কারণ ঐ তারিখেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সিংহের পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও অন্যান্য ভাইদের কাছ থাকে তৎকালীন সরকারী নিয়ম মেনে ৫.০০ (পাঁচ টাকা) জমা করে, কবুলতি দিয়ে "কুড়িবিঘার শান্তিনিকেতন"এর মৌরসী পাট্টা গ্রহণ করেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন নামে অঞ্চল ও গৃহ যে ঐ স্থানে আগেই ছিল তার পাথুরে প্রমাণ মেলে পাট্টা পত্রের অনুলিপিতেই। তহশীল চৌহদ্দীতে লেখা আছে "-বান্দের উত্তরাংশে সান্তীনীকেতন বান্দের উত্তরাংশে সান্তীনীকেতননামা গৃহের চতুরপার্শের মধ্যে ২০/বিঘা"। আর 'বান্দের উত্তরাংশে' বলতে 'ভুবনসাগর' বা 'ভুবনডাঙ্গার বাঁধটির' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বাঁধটি তৈরি হয়েছিল ১২৩৩ বঙ্গাব্দে। যেহেতু তখন চৌহদ্দী উল্লেখ করেই জমি হস্তান্তর হতো

তাই এ সূত্র ধরেও জানা যায় ১৮ ফাল্গুন ১২৬৯ বঙ্গাব্দে আগেও শান্তিনিকেতনগৃহের অস্তিত্ব ছিল তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। আর 'রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া এই তথ্যও ভুল। কারণ "জমিটি পাট্টা নিতে ইচ্ছা করায় কোম্পানির নিয়মে বিঘা প্রতি ।০ চার আনা হিসাবে কোম্পানির নিয়মে মোট পাঁচ টাকায় মহর্ষিকে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল- দান হিসাবে দেওয়াও হয়নি এবং মহর্ষিদেব দান গ্রহণও করেননি। আইন মাফিক শর্তসাপেক্ষে কবুলতি দিয়েই 'কুড়িবিঘার শান্তিনিকেতন' তিনি গ্রহণ করেন।"[১৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি থেকে কথাগুলি জানিয়েছেন, সেগুলিকেই অকাট্য সত্য হিসাবে মেনে না নিয়ে আমাদের উচিৎ তা একটু হলেও যাচাই করে দেখা । তা না হলে ভুল তথ্যের বহুল চর্চায় আসল সত্য চাপা পড়ে যাবে।

শান্তিনিকেতনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এসেছিলেন একেবারে ব্যক্তিগত সাধনার উদ্দেশ্যে কিন্তু সময় ক্রমে তা হয়ে উঠল ব্রাহ্মধর্মের প্রথম আশ্রম। ১২৯৪ সালের ২৬ ফাল্গুন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রাহ্ম সমাজের অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বার্ষিক ১৮০০ টাকা (আঠার শত টাকা) আয়ের সম্পত্তি দান করে শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টিডিড তৈরি করান। এই ডিডের উল্লিখিত ব্যক্তিগণ হলেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, কৃপানাথ মুন্সী। ১২৯৫ সালের শান্তিনিকেতন সংস্কার ও মেরামতের কাজ শুরু হয়। শান্তিনিকেতন গৃহটি আকারে বৃদ্ধি পায়, সেটিকে নানারকম আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় যাতে সেটি বসবাসের উপযুক্ত হতে পারে। মহর্ষির সংগ্রহীত বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি বই নিয়ে একটি ছোট গ্রন্থাগারও সাজানো হয়। এই গ্রন্থাগারটিই পরবর্তী কালে ডালপালা বিস্তার করে শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে। শান্তিনিকেতন সংস্কার হয়ে

যাবার পর মহর্ষির নির্দেশে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে পৌঁছে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন করেন। তারপর ৪ঠা কার্ত্তিক ১২৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রমুখ গুণীজনের সমাগমে শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম'এর প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৪ঠা কার্ত্তিক বৈকাল বেলায় বোলপুর, সুরুল, রায়পুর প্রভৃতি গ্রামের "প্রায় দুইশত হিন্দুসমাজের গুণীজনের আগমন ঘটে"। এই প্রতিষ্ঠা সভায় রবীন্দ্রনাথ, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় দুজনে আচার্য্যের দায়িত্ব পালন করেন। মোহিনীবাবুর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা এবং রবীন্দ্রনাথের গান সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এছাড়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় দু'চারখানি সংগীত পরিবেশন করেন।"[১৮] এই অনুষ্ঠানের শেষে সমাগত সকলকে সরবৎ এবং পান দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এরপর থেকে শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা শুরু হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে 'বুধবার' খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১২৫০ সালে ৭ই পৌষ (১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ ২১শে ডিসেম্বর) মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন, ১২৯৫ সালে অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ ২৪ অক্টোবর, 'বুধবার' আশ্রমের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আবার ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার দিনেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্যআশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই সাপ্তাহিক উপাসনার ও ছুটির দিন হিসেবে বুধবারকেই নির্দিষ্ট করা হয়। সেই নিয়ম বর্তমানেও বলবত আছে।

----------তথ্যসূত্র----------

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ৩৩৪-৩৩৫

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭, পৃ ৩৯

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী'দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭, পৃ ৩৯

৪. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি ও শান্তিনিকেতনের কথা', কলকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক, ১৯৫০, পৃ ১২

৫. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আকাদেমি সং-২০১৩, পৃ ৫১৮

৬. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেত', কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং ভাদ্র ১৩৮২, পৃ ১৭

৭. বুদ্ধদেব আচার্য, 'রূপান্তরে শান্তিনিকেতন, কলকাতা, দীপ, ২০১০, পৃ ৫২

৮. অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ২৯

৯. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আকাদেমি সং-২০১৩, পৃ ৫১৮

১০. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি ও শান্তিনিকেতনের কথা', কলকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক, ১৯৫০, পৃ ১৭

১১. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘শান্তিনিকেতনের স্মৃতি ও শান্তিনিকেতনের কথা’, কলকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক, ১৯৫০, পৃ ১৭

১২. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আকাদেমি সং-২০১৩, পৃ ৫১১

১৩. অজিতকুমার চক্রবর্তী, ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আকাদেমি সং-২০১৩, পৃ ৫১৪

১৪. অজিতকুমার চক্রবর্তী, ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আকাদেমি সং-২০১৩, পৃ ৫১৮

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ৩৩৪

১৬. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘শান্তিনিকেতনের স্মৃতি ও শান্তিনিকেতনের কথা’, কলকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক, ১৯৫০, পৃ ১৭

১৭. বুদ্ধদেব আচার্য, ‘রূপান্তরে শান্তিনিকেতন’, কলকাতা, দীপ, ২০১০, পৃ ৩৪

১৮. বুদ্ধদেব আচার্য, ‘রূপান্তরে শান্তিনিকেতন’, কলকাতা, দীপ, ২০১০, পৃ ৩৪

ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র জীবনাদর্শের যাত্রাপথ

ভূপালের নবাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শতাব্দীর 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন- "রবীন্দ্রনাথ যাতেই হাত দিয়েছেন তাতেই সফলতা লাভ করে তিনি বিশ্বখ্যাতির আধিকারী হয়েছেন। কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না-শান্তিনিকেতনের ন্যায় প্রতিষ্ঠানই তার প্রমাণ। সেটিই তাঁর বাস্তব কীর্তি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার দ্বারা প্রভাবিত হবে।"[১] তিনি তো কেবলমাত্র সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত করেননি, জীবনযাপনের মাধ্যমকেও নতুন ভাবে সৃষ্টি করতে শিখিয়েছেন। তিনি কবি হিসেবে খ্যাত হয়ে বিশ্বের দরবারে সমাদর লাভ করেছিলেন, আর 'শান্তিনিকেতন'কে 'বিশ্বভারতী'তে উন্নীত করতে পেরে নিজের মনের কাছে সমাদর লাভ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে স্বদেশে, স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য প্রথমেই তাঁদের স্বাবলম্বনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। কারণ ব্যক্তি জীবনের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি কাজে তাঁরা যদি পরমুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচে তবে কখনই তাঁরা স্বাধীনতার আনন্দ অনুভব করতে পারবে না। তাই ভারতবর্ষের নিজস্ব আদর্শে তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যা তাঁদের জন্য উপযুক্ত, "ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের

অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। ‘এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি ‘বিশ্বভারতী’ নাম দেবার প্রস্তাব করিয়াছি।”[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিপত্র গুলো একটু সন্ধান করলেই বোঝা যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম নির্মাণ তাঁর নিজেকে প্রকাশেরই অন্য একটি মাধ্যম। যেমন করে নিজেকে প্রকাশের জন্য তিনি গান লেখেন-সুর দেন, কবিতা লেখেন, ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন অভিব্যক্তি ঠিক তেমনি আশ্রম-বিদ্যালয় নির্মাণও তাঁর কাছে ঐরকম একটি নতুন সৃষ্টি। ‘শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।’[৩] এ কথা ঠিক যে কবিগণ তাঁদের মানস কল্পনায় এমন একটি ‘আদর্শলোকের’ স্বপ্ন দেখেন যা একেবারে নিখুঁত, সুন্দর ও সর্বত ভাবে ভালো ‘ইহাকে বলা হয় utopia’। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তপোবন’ আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভাবনাও খানিকটা ঐরকম, কিন্তু তফাৎ হল কেবল কল্পনার রাজ্যে বাস করলে তিনি কখনই ‘বিশ্বভারতী’র মত প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারতেন না। সে সময় স্বদেশী আন্দোলন, ইংরেজ রাজত্বের কুটিল নৃশংসতা, শহর কলকাতার রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বাবুয়ানিতে ক্ষয়ে যাওয়া সংস্কার, নতুন প্রজন্মের প্রাপ্ত শিক্ষায় ছাঁচে ঢালা কেরানী তৈরির প্রক্রিয়া ইত্যাদি পরিস্থিতির হাত থেকে আগামী প্রজন্মকে নতুন পথের সন্ধান দেবার সংকল্প অনেকদিন ধরেই তাঁর চিন্তা ভাবনায় ঘোরাফেরা করছিল। “তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম।”[৪] তার প্রবন্ধগুলিতে নিজের জীবনের এমন অভিজ্ঞতার কথা তিনি বারবার বলেছেন। তবে এইখানেই থেমে না গিয়ে তিনি এর থেকে মুক্তির পথের হদিসও দিয়েছেন, যে ভাবে তিনি

মুক্তি পেয়েছেন বিশ্বপ্রকৃতির কাছে। "শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড় মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্ব প্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনীর বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে।"[৫] অর্থাৎ এইরূপ 'প্রতিকারহীন বেদনা'র সমাধান করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ভারতবর্ষে প্রাচীন আশ্রমবিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় পথ খুঁজছিলেন। তাঁর কল্পনায় সেসময় তাই বারবার ফিরে আসছে কালিদাসের যুগের সাংসারিক ঋষি-ঋষিপত্নীদের সন্তান ও শিষ্যদের নিয়ে নিরাসক্ত বাহুল্যবর্জিত জীবনযাপনের আদর্শ। যেখানে কিছু মানুষ শহরের জটিলতা থেকে অনেক দূরের একটি জায়গায় কেবল জ্ঞানপিপাসায় একত্রিত হবেন এবং বিশেষ জ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন চলবে প্রকৃতির আবহে। চিঠিতে জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখছেন–"শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহে বাসের-মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না—ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে।"[৬] ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাঁধন কেটে তাঁরই পরিপন্থী একটি সমান্তরাল শিক্ষা ধারা হিসেবেও শান্তিনিকেতনকে তিনি দেখতে চাইছিলেন। তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্কুলকে হুবহু তপোবনই গড়ে তুলতে চাইছেন না। তিনি জানতেন 'ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার

বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।' তপোবনের ভাবটাকেই তিনি কেবল নিতে চেয়েছিলেন। তিনি বাস্তবানুগ ভাবেই তার রূপায়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। কোন কল্পিত আদর্শকে তিনি যেমন তাঁর সৃষ্টি কর্মে স্থান দেননি, নিজে অনুভব করে তবেই প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তেমনি অনুকরণ না করে আত্তীকরণ করেছেন।

১৩০৮ সালে আশ্বিন মাসে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন কবি বিলাতপ্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠিতে লিখছেন–'...কলিকাতার আবর্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছে করে না।...পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।[৭] শান্তিনিকেতনকেও তিনি এই ভাবনায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন-"উপকরনের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাইরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে, যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ড কালের অতীত ;"[৮] তাঁর লেখায় স্পষ্ট যে শান্তিনিকেতনে তিনি 'খণ্ড কালের অতীত'কেই নির্মাণ করতে চাইছেন। শান্তিনিকেতন নির্মাণের দ্বারা আসলে তিনি ভারতবর্ষেরই নির্মাণ করতে চাইছেন। রাজশক্তির বিরুধে তাঁর যে দ্রোহ, সেই দ্রোহে জয়ের উপায় হিসাবে স্বদেশের ঐতিহ্যকে আরো একবার তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন আদতে তাঁর স্বাধীন ভারত চিন্তারই নামান্তর। 'ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা; ...সর্বপ্রকার অবমাননা নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।'

তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষের 'সভ্যতার যে প্রৈতি (energy)'[৯] তা বাইরের সংঘাত থেকে তৈরি হয়নি, তাই তা বহির্মুখী নয়। তাঁর মূলগত ঐশ্বর্য আছে ধ্যানের মাঝে, অন্তরের সাধনার দ্বারা তা বিশ্বের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। এই যে আহ্বান তাঁর মনকে অস্থির করে তুলেছিল তা কেবল বানী রূপে নয় তাঁর কাজেও প্রভাব ফেলেছিল। যতক্ষণ তা প্রবন্ধ আকারে ছিল ততক্ষণ তা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্পনার বস্তু, যে মুহূর্তে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম নির্মাণের কাজে হাত দিলেন তখনই তা বাস্তবে রূপ লাভ করল।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সূচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন ও সংলগ্ন এলাকাটি ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬ খ্রি.) 'ট্রাষ্ট ডীড' তৈরি করে শান্তিনিকেতনের উন্নয়নার্থে উৎসর্গ করেন এবং নিজের জমিদারির খানিকটা অংশ সেখানকার ব্যয় নিরবাহের জন্য 'দেবত্র' করে দেন। এই ডীডেই তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয়, পুস্তকালয় স্থাপন ও অতিথি সৎকারের উল্লেখ করেছিলেন। 'ট্রাষ্ট ডীড'এর নিয়মানুসারে "কোনো মূর্তি বা প্রতিমা বা প্রতীক পূজা হইতে পারে না। কোনো ধর্মের নিন্দা, মদ্য মৎস মাংস-ভোজন ও জীবহত্যা নিষিদ্ধ; নিন্দনীয় আমোদ আহ্লাদও হইতে পারে না।"[১০] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল এইস্থান 'সাধনকামীদের' আশ্রয় হয়ে উঠুক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে এই আশ্রম বিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনা শুরু করেন, কিন্তু সে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি অকালে মারা যান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাঁর সে ইচ্ছা ফলিত হয়েছে। তবে সে সাধনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে আরও বৃহত্তর, যা বিশ্বের জ্ঞান সাধকদের মুক্ত জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

পিতামহের ইচ্ছাপূরণের জন্য বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নিখিল একেশ্বরবাদীদের মধ্যে' যোগাযোগ তৈরি করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে ছিলেন। সেই ভাবনা অনুসারে তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনার জন্য একটি নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করেন। যেখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা ছিল 'ব্রাহ্মধর্মানুমদিত শিক্ষা প্রণালী' অনুসারে বিদ্যালয়ের পরিচালনা করতে হবে। প্রতিদিনের পাঠের মধ্যে মূল ব্রাহ্মধর্মের পাঠ, ব্যখ্যা ও ব্রাহ্মধর্মের আচরিত পদ্যগুলি অবশ্য পাঠ্য হিসাবে রাখতে হবে। সব শিক্ষার্থীকেই আশ্রমে থেকে পড়াশুনা করতে হবে। সেজন্য তিনি একটি একতলা বাড়িও প্রস্তুত করান, যা পরবর্তী কালে গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবসত ১৩০৬ বঙ্গাব্দে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাল প্রয়াণ ঘটলে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সফল হয়নি। তবে এর ঠিক দুবছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও একবার উদ্যোগী হয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন, তবে তিনি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বানানো নিয়মগুলির খুববেশি পরিবর্তন করেননি। তাছাড়া ১৮৯৯ সালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'। নামটি ট্রাস্টি অনুমোদিত ছিল তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও খাতায়-কলমে এই নামটি অপরিবর্তিত রাখেন। আসলে ঠিক এই সময়ই তিনি নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার জন্য ঠিক এমনই একটি স্থানের আয়োজনের কথা ভাবছিলেন। শিলাইদহে গৃহ শিক্ষকদের সাহচর্যে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চার আয়োজন করলেও সন্তানদের সম্পূর্ণ শিক্ষার ব্যপারে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল গৃহের মধ্যে এই শিক্ষায় যেন কোনও খামতি আছে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে পাকাপাকি বসবাসের পরিকল্পনা ও কারণ জানিয়ে মৃণালিনী দেবিকে চিঠিতে লিখছেন- "নির্জনতায় তোমাদের পীড়া দেয়... হঠাৎ এখানকার মতো শূন্য স্থানের মধ্যে এসে পড়ে কিছুদিন নিশ্চয়ই

তোমাদের ভালো লাগবেনা" "কিন্তু কি করি বল,...সেখানে রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না—...কাজেই তোমাদের এই নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করতেই হবে।"[১১] দ্বিতীয়ত, প্রাচীন আশ্রম শিক্ষার ভাবনাও এই সময় তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুই ভাবের মিশ্র প্রভাবেই তিনি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরদ্ধ কাজের যথাযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। যদিও এর অনেক আগে থেকেই শান্তিনিকেতন তাঁর কাছে তীর্থ স্থানের মতই ছিল এবং বহুবার শান্তির সন্ধানে তিনি এখানে এসেছেন। তবে তা একেবারে ব্যক্তিগত সাধনার কারণে, এই স্থানটিকে কেন্দ্র করে যে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের বিস্তার ঘটাবেন এমন ভাবনা তাঁর আগে মনে হয়নি। বোধ হয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনার সূত্র ধরেই এ ধারণা তাঁর মনে আসে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাল মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারণা হয়েছিল তাঁর কাঙ্ক্ষিত আশ্রম আর হয়ত হবে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন উদ্যোগ নিলেন "মহর্ষি বুঝিতে পারিলেন, রবীন্দ্রকে দিয়াই তাঁহার আরদ্ধ কার্য সম্পন্ন হইবে; তিনি দিব্য চক্ষে দেখিলেন, 'যে সাধনা গোপনে পর্বতের গুহার মধ্যে নির্ঝরের মতো লুকানো ছিল সে লোকালয়ে নদীর কল্যাণ ধারার মতো এক্ষণে প্রবাহিত হইয়া চলিল।' মহর্ষির উৎসাহ ও আশীর্বাদ বহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।"[১২]

নিজের জীবনে মাত্র তেরো বছর বয়সে যিনি স্ব-ইচ্ছায় মনোবল সঞ্চয় করে 'এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে' আসতে পেরেছিলেন তার দ্বারাই তো সম্ভব নিজের মনের মত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার, এতো কেবল ছিল সময়ের অপেক্ষা। প্রথাগত বিদ্যার কারাগার ভেঙ্গে তিনি যে শিক্ষার আঙিনায় এসে পড়েছিলেন সেখানে তাঁর

‘কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।’[১৩] পরবর্তী কালে ভার লাঘবের শিক্ষা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য গড়ে তুললেন শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও তাঁর বিষয়বুদ্ধির অভাব ছিল না। তিনি ভাব জগত ও বাস্তব জগতের সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারতেন। একই হাতে প্রজাদের অত্যাচার না করে যেমন জমিদারি সামলেছেন তেমনি তাঁদের উন্নতি কল্পে নানা সংগঠনমূলক কাজও করেছেন। নালন্দার মতো বিশ্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, গুরুকুলের আদর্শ পুনরায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, তিনিই আবার ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে বিশ্বভারতীতে উন্নীত করতে পেরেছেন নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। অর্থাৎ তাঁর ভাবনার জগত কোন অলীক স্বপ্ন নয়, মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য তাঁর দ্বারা কৃত গভীর অন্তঃরনিষ্ঠ চিন্তা-ভাবনার ফসল। সে কারনেই তা বাস্তবের মাটিতে সহজে স্থান করে নিতে পেরেছিল। ‘আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি।’[১৪] তিনি বিষয় জ্ঞানী তাই লোকসানে চলা জমিদারীতেও লাভ করতে পারেন, তিনি বিষয় জ্ঞানী তাই নিজের আর্থিক দূরবস্থার কথা মাথায় রেখেও ‘বোর্ডিং স্কুল’ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং নিজের স্ত্রীর গয়না বেচে, নোবেল পুরষ্কারের টাকা দিয়ে প্রায় সর্ব ত্যাগী হয়ে বিশ্বভারতী তৈরি করতে সাফল্য লাভ করেন। ১৩৫৭ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ আয়োজিত অর্ঘ্য দান সভায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ভাষণে বলেন- “গুরুদেব সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বিশ্বভারতীর এই রূপ একটি যোগস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন যাতে মনে হত আমরা যেন শান্তিনিকেতন নামে কোনো পরিচ্ছন্ন স্থানে নয়, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাস করছি। জাতি-ধর্ম-দেশ নির্বিশেষে জগতের সকলের সঙ্গে আমদের সম্বন্ধ। সকলের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী। ...টাকা দিয়ে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, বিশ্বভারতী স্থাপন করা যায় না।

আমার তো মনে হয়, তিনি নিজের মহিমায় বিশ্বভারতীর জন্য যে কাজ করেছেন, অতি বিপুল অর্থ ব্যয় করেও অন্যের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না।”[১৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিচারণায় বারবার বলেছেন উপনয়নের পর শান্তিনিকেতনে ভ্রমণ করতে এসেই তিনি জীবনে প্রথমবার বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছাড়া পেয়েছিলেন। “আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথমবয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম—এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল-শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যমলা শান্তি স্মৃতির সম্পদ রূপে চিরকাল আমার স্বভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।”[১৫] অর্থাৎ প্রথম দর্শন থেকেই শান্তিনিকেতন তাঁর কাছে তীর্থস্থানই ছিল, তাঁর বাবাকেও ধ্যানগম্ভীর অবস্থায় এখানে সাধনা করতে দেখেছিলেন, বহুবার শান্তির সন্ধানে ব্যক্তিগত সাধনার উদ্দ্যেশ্যে তিনি এখানে আসতেন। সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়ছে। তাই পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরিধিকে কেবল ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না। তিনি তো জীবনীশক্তি প্রবাহের দ্বারা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মত ছোট ছোট নিয়ম শৈথিল্য নিয়ে তিনি ক্ষুদ্র চিন্তায় ডুবে থাকতেন না। বিচিত্র কর্ম ধারা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের অন্তরের গুণকে প্রকাশের প্রেরণা দিতেন। সেকারনেই শীঘ্র এই প্রতিষ্ঠানটি শাখায় শাখায় বিস্তার লাভ করল। প্রতিদিন একটু একটু শৈল্পিক রুচি পরিমার্জনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে জীবন শিল্প গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকা প্রতিটি মানুষের জীবনেও সেই রুচি বোধ সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সিন্ধি শিক্ষক রেবাচাঁদ শান্তিনিকেতনে আসার পর

থেকেই প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের জ্ঞানকে একীভূত করবার ইচ্ছা জাগে। তারপর থেকে বিদ্যালয়ের কাজকর্মে ও আদর্শে তিনি পরম্পরাগত পরিবর্তন আনেন। বিদ্যালয়ে এতদিন ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতিতে যে উপাসনার নিয়ম চালু ছিল তাতে ঔপনিষদিক-ধর্ম ছাড়া আর কিছুর সাধনা হত না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে একে পৌষ উৎসবে 'বড়দিন' অর্থাৎ খ্রিষ্টোৎসব ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম তিথিতে স্মরণের পরিকল্পনা করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ভাবনার এই যে বন্ধনহীনতা, শান্তিনিকেতনে থেকে বিশ্বভারতী হয়ে ওঠার পিছনে তাও যথেষ্ট লক্ষ্যনীয়। "আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে এই সহযোগিতার মনোভাব সমস্ত দিক দিয়েই তাঁর চিন্তায় ও কাজে বিধৃত ছিল। তিনি ডিক্টেটরি শক্তির বিরোধী ছিলেন। প্রেম, সত্য ও ভগবৎ প্রেরণায় অনুরক্ত থেকে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তাতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কবি-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে সামাজিক, জাতিগত ও ভৌগোলিক কোনও ভেদাভেদ নেই। সকল দেশের বিদগ্ধজনেরা সেখানে সমাদৃত।"[১৬] তিনি জানতেন কোনও একটি দেশকে জানতে গেলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই জানতে হয় । ভারতবর্ষ চিরকাল তার উদার হৃদয়ে সকল প্রকার মানুষের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে চেয়েছে। তার মুক্ত হস্ত নিখিল মানবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিশ্বভারতীর মধ্যমে সেই যোগসূত্রকে তিনি আরো দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল 'বোলপুর বিদ্যালয় প্রাদেশিক থাকিবে না—সাম্প্রদায়িক হইবে না।' তাই শিশু কাল থেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে আগত শিক্ষার্থীদের একই সঙ্গে থাকা ও বেড়ে ওঠার বন্দবস্ত করতে হবে, যাতে তাঁরা একে অন্যের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠতে পারে। সেই ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ১৯১৬ সালে শিকাগো থেকে

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠিতে বলছেন- "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্চে –ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তাঁর প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।"[১৭]

আধুনিক কালে শিক্ষার সঙ্গে খেলাধুলা, নাচ-গান ইত্যাদিও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু সেই যুগে এমনটা ছিল না। কিন্তু শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম পাঠ্য বহির্ভূত শিক্ষা যেমন ঋতু-উৎসব, নাট্যাভিনয়, নৃত্যগীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কিভাবে একই সঙ্গে সংযম ও স্বাধীনতার পাঠ দেওয়া যায় সে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। শিক্ষাকে ব্যক্তিক ক্ষেত্র থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি ব্যষ্টিক আবেগকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। যার দ্বারা নিয়ম ও আনন্দ দুয়ের সহযোগে মনের আবরণ যাবে খসে। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনার সময় পুঁথিগত বিদ্যের উপর তিনি দাঁড়ি টানতে চেয়েছিলেন। বই পড়াটাই যে শিক্ষা, শিক্ষার্থীরদের মনে এমন কুসংস্কার যেন না জন্মায় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষার যা যা ত্রুটি তাঁর গোচর হয়েছিল তা যতটা সম্ভব তিনি বিশ্বভারতীর দিকে এগোবার সময় শুধরে নিয়েছিলেন। সকল শ্রেণির মধ্যে সহশিক্ষা অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্থীদের শাসনের ও সংশোধনের ভার তিনি তাদেরই উপর দিয়েছিলেন। তাদের সন্দেহ করবার থেকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণের উপরই তাঁর বেশি আস্থা ছিল। প্রবাসী পত্রিকায় লিখেছিলেন–" আমাদের স্বভাবের মধ্যে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, একথা বলা অত্যুক্তি, কিন্তু তাকে নিয়ে বাইরে থেকে যত অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধি করতে যাব ততই সেটা ব্যধিতে এসে দাঁড়াবে। এই সংশয়কে অগ্রাহ্য করার দ্বারাই একে বিনাশ করা

যায়। ...মানবচরিত্রের স্খলন প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই আছে, ভিতরে তাঁর উত্তেজনা আরও বেশি। বস্তুত আচারের দ্বারা মানুষের মনকে বিশুদ্ধ করা যায় না, বরঞ্চ তার বাড়াবাড়িতে চরিত্রের মূলে দুর্বলতা ও নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে। ভিতরের মানুষের পরেই দাবি রাখতে হবে, দারোয়ানের পরে নয়।...আমি মেয়েদের স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাদের আমি সন্দেহের কারাকুঠুরিতে পৃথক রাখতে দেখতে ব্যথা পাই।"[১৮]

প্রাচীন ভারতীয় ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে বিশ্বভারতীর শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় রীতিনীতি নির্ধারণের সময় খুব স্বতন্ত্র ধারায় কেবল সেই সব রীতি বেছে নিয়েছিলেন যা ভারতীয় আদর্শের চিহ্ন বাহক অথচ সংকীর্ণতাহীন। যে পদ্ধতির সঙ্গে গুরুকুল শিক্ষা ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেমন বিক্রমশীলা, নালন্দা) যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্নাতকদের শংসাপত্রের সঙ্গে ছাতিম পাতা দানের প্রথা প্রচলিত আছে, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাইতেন সূর্যের সাতটি রঙের মত সপ্তপর্ণ সাতটি পাতা শিক্ষার্থীদের জীবনকে সর্বত ভাবে রাঙিয়ে তুলুক, তাঁদের প্রকৃত শিক্ষা তথা বোধি বা চৈতন্যশক্তির উন্মেষ হোক। তাঁরা অনুভব করুক বিদ্যা কেবল বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনও বস্তু নয়, কেবল অর্থ উপর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিদ্যা হল তাই যা জীবনকে পূর্ণতা দান করে, যা জীবনেরই বিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই ধারনার প্রতীক মেনেই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'দীক্ষান্ত ভাষনের পর আচার্য স্নাতকদের বোধিবৃক্ষের পাতা দিয়ে আশীর্বাদ করেন, যা একসময় শিক্ষার্থীদের কাছে শংসাপত্র অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর শিক্ষকদের জন্য ব্যবস্থা ছিল 'দেশিকোত্তম উপাধি' প্রদানের। প্রাচীনকালে গুরুকুলে শিক্ষকদের বলা হত 'আচার্য' ও

‘দেশিক’। এর মানে হল ‘দে’ দেবরূপধারী, ‘শি’ শিষ্যের কল্যাণকারী ও ‘ক’ করুণাময়। যে আচার্যগণ এই সব গুণের অধিকারী হতেন তিনি লাভ করতেন ‘দেশিক’ উপাধি। আর যিনি দেশিককুলে সর্বোত্তম স্থান লাভ করতেন তিনি হতেন ‘দেশিকোত্তম’। এর থাকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল তপোবনের আদর্শের ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে বিশ্বভারতীর সূচনা করেছিলেন তা নয়, তপোবনের শিক্ষণ রীতির শুভ ও উন্নতিমূলক দিকটির বাস্তব রূপ দিতেও সমর্থ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তির পর থেকে তাঁর পরিচিতি যত বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত ও উৎসাহী মানুষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও তত বেড়েছে। তাঁর মনে হয়েছে “জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারনেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।”[১৯] সকল দেশের সংস্কৃতিকে একই আঙিনায় এনে তিনি বিদ্যা সমবায় তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। বিশ্বভারতীতে তাই নানা সময় কিছু দিনের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু অধ্যাপক এসে যুক্ত হয়েছেন। উইলিয়াম পিয়ারসন, চার্লস এন্ড্রুস, জাপানী মনীষী ওকাকুরা, শিল্পী রোদেনস্টাইন, জার্মানি পণ্ডিত কাইজারলিং, ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশ, ফরাসী শিল্পী আঁদ্রে কার্প্লে ও সুজাঁ কার্প্লে, রুশ ভাষাবিদ বগদানভ, লন্ডনের ভাষাতত্ত্ববিদ স্মিথ, সস্ত্রীক সিলভিয়ান লেভি, চেকস্লোভাকিয়া থেকে পন্ডিত উইন্টারনিজ, পার্সী অধ্যাপক এইচ পি মরিস, গেডিস, সুইজারল্যন্ড থেকে বেনোয়া, ম্যলেরিয়া বিশারদ কর্নেল বেন্টলি, লেসনি, তুচ্চি, স্তেন কোনো, কার্লো ফরমিকি, কলিন্স, আন্দ্রে কারপেলেজ, হ্যারি

তিম্বারস, লেনার্ড এলমহারস্ট, চীনা পন্ডিত তান-য়ুন-শান প্রমুখ মনস্বীগণ। কারণ এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত ও আমেরিকার নানা দেশ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করছেন, শিক্ষাচিন্তাবিদ মানুষজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। এ বিষয়ে আমেরিকা থেকে জগদানন্দ বাবুকে চিঠিতে লিখছেন- "মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি... মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগ যুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না ?"[২০] 'বিদ্যা সমবায়' প্রবন্ধতেও এমন কথাই বলছেন- "আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান ও তুলনা হইবে, ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।...আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্শি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিক ভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।"[২১]

আসলে বিশ্বভারতীকে কেবলমাত্র ডিগ্রী বিতরণকারি কোনও প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার ইচ্ছা কবির ছিলনা। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রাচীন আচার্যদের মতো এখানে 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'-বলে সকলকে আহ্বান জানানো। অর্থাৎ সকল জলধারা যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলের জ্ঞান ধারা এই স্থানে এসে মিলিত হোক। শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা কাল থেকেই এই স্বতন্ত্র ধারণার বোধ তাঁর ভাবনায় ছিল। সে কারনেই বিশ্বভারতী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যার আবহাওয়ার মধ্যেই আছে বিশাল-মুক্ত 'সৃজনীপ্রতিভা' যা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদিনের জীবনকে নতুন নতুন আনন্দে উজ্জীবিত করে, প্রাণবন্ত করে। ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলার বিকাশে শান্তিনিকেতন এমন একটি আদর্শ স্থাপন করেছে যে

তাকে কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে বস্তুত ছোট করা হয়। সাহিত্য-সঙ্গিত-শিল্প এই তিনের সমন্বয়ে বিশ্বভারতী সেদিন ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম একটি আকর হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে জোয়ার এসেছিল তা কেবল শান্তিনিকেতনের গণ্ডির ভিতরেই আবদ্ধ ছিল না, তা প্রভাবিত করেছিল সমগ্র দেশের শিক্ষা চিন্তাকে। এ প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র সঠিক মন্তব্য করেছিলেন- "রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পী ছিলেন না—দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে শিক্ষাব্রতী রূপে তিনি যে বাণী প্রচার করেছেন তা সকলে কাছে প্রেরণার উৎস স্বরূপ।"[২২]

----------তথ্যসূত্র----------

১. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ’, কলকাতা, আনন্দ, ২০০৭, পৃ ৬৩৯

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বিশ্বভারতী’, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭২, পৃ ৩৪৬

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ৩৩২

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২ পৃ ৩২৭

৫. ঐ

৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ৩৪

৭. ঐ

৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ৩৬

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ৭৯

১০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ৩২

১১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ৩১

১২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ৩৩

১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ৩১]

১৪. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ’, কলকাতা, আনন্দ, ২০০৭, পৃ ৫৫৫

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২ পৃ ৩২৭

১৬. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ’, কলকাতা, আনন্দ, ২০০৭, পৃ ৬৩৭

১৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ৩৬

১৮. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’ , কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ৫৪

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, ‘শিক্ষার বাহন’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ১৪২

২০. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ৫৫

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, ‘বিদ্যা সমবায়’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ১৭৮

২২. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ’, কলকাতা, আনন্দ, ২০০৭, পৃ ৬৪১

শান্তিনিকেতনের বিস্তারে শ্রীনিকেতন

শান্তিনিকেতন বিস্তার লাভ করে বিশ্বভারতীতে পরিণত হবার পরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুভব করলেন তাঁর শিক্ষা চিন্তা কেবল বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে যাচ্ছে, দেশের সাধারন মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে তা মিলতে পারছে না। "যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল।...ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তার জন্য কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল।"[১] 'গ্রামের লোকেদের খাদ্যনেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। ...শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই যে এরা খাদ্য থেকে বঞ্চিত, ...এক বিন্দু পানীয় জল থেকে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনও উপায় নেই।' 'এমনি সময় আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নতুন একটা কর্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হল, মনে হল শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করব।'[২] তিনি জানতেন অর্থ সাহায্য বা কর মুকুবের দ্বারা গ্রামের মানুষদের সাহায্য করলে তা তাঁদের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেবে, অথচ তাঁদের উন্নতি না হলে দেশের ও দশের সমপরিমাণ ক্ষতি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই দূরত্ব দূর করবার জন্য তাঁর মনে নতুন পরিকল্পনার সঞ্চার হয়। তাঁদেরকে স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি আগ্রহী হন- "...চেষ্টা করতুম-কি করলে এঁদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনার দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমি যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে।"[৩] তাই বিশ্বভারতীর সহায়ক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুললেন শ্রীনিকেতনকে।

বিশ্বের নানা দেশে বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী মানুষের আহ্বানে আতিথ্য গ্রহণ ও আলাপ-আলোচনার সময় কবি নানা দেশের শিক্ষা প্রণালী ও শিক্ষাচার নিয়েও রীতিমত চর্চা করতেন। সে সময় তিনি লক্ষ্য করেন "সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবল মাত্র কেরানীগিরি ওকালতী ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুরঘানি কুমারের চাকা-ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাঁহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপর নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে।"[৪] এ কারনেই তাঁর মনে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবনা আসে যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সার্বিকভাবে যুক্ত হতে পারে এবং সাধারণ ক্ষেতে খামারে কাজ করা মানুষজনও এই শিক্ষার সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে পারে। কুটির শিল্প-কৃষি কাজই যে আমাদের গ্রামীণ সভ্যতার স্বনির্ভরতার ভিত্তি সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই এগুলি সঙ্গে নিয়েই শিক্ষার বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। শ্রীনিকেতন হল সেরকমই একটি প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি পরিচালনার সময় থেকেই গ্রাম উন্নয়নের নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতন স্থাপনের পর তা আরও বিস্তার লাভ করে। এ সময় কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসার জন্য আহ্বান জানান। পল্লী উন্নয়নের কাজে তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতার কথা জানতে পেরে তাঁকে এই কাজে আরও উৎসাহ দেন। কালীমোহন ঘোষেও সানন্দে শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দেন। ক্রমে পল্লীউন্নয়নের কাজে

তিনি হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বস্ত সহচর'। তারপর অবশ্য এই কাজে পাশে পেয়েছিলেন লেনার্ড এলমহার্স্টক, মিসেস স্ট্রেট, সন্তোষকুমার মজুমদার, গৌরগোপাল ঘোষ, সন্তোষকুমার মিত্র, নেপালচন্দ্র রায় প্রমুখ স্বহৃদয় স্বেচ্ছা সেবকগণকে। এ সময় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন-"পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মিয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবী কালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখন শুষ্ক হয় না। ...পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে, তাঁরা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য-বিধানের প্রতিষ্ঠা।"[৫] তাঁর ইচ্ছা ছিল পল্লী উন্নয়নের কাজে পল্লীবাসীদের দ্বারাই সম্পন্ন হোক কারণ 'সৃষ্টি কাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়।' আর এই আনন্দের বোধ সকলের মধ্যে সঞ্চার করতে পারলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

শ্রীনিকেতনের সূচনা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন- "স্থির হইল সুরুলের কুঠিবাড়ি এই গ্রামোলনেরগের কেন্দ্র হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনায় কয়েকজন যুবক শান্তিনিকেতনের শিক্ষকশান্তিনিকেতনে নেপালচন্দ্র রায়ের (অসহযোগের সময় কয়েক মাস তিনি বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া যান) নেতৃত্বে 'গ্রামের কাজে' প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের লইয়া এলমহার্স্ট সুরুলে কার্য শুরু করিবেন ঠিক হইল।"[৬] সুধীরচন্দ্র কর জানিয়েছেন-"১৯১২

সনে (১৩১৯) সুরুলের কুঠিবাড়িখানি কবি রায়পুরের কর্নেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের নিকট থেকে ক্রয় করেন। দশ বছর পর ১৯২২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি সেখানে মিঃ এলম্হার্স্ট 'গ্রাম-পুনর্গঠন কেন্দ্র' স্থাপন করলেন। একদল কর্মী নিয়ে তিনি স্বাবলম্বনের আদর্শে জীবনযাত্রা নির্বাহ ও বিশেষ করে কৃষির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। কিছুদিন পরে তিনি চলে গেলে শান্তিনিকেতনের সন্তোষকুমার মজুমদার এসে ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সন অবধি এ প্রতিষ্ঠান চালনা করেন। তাঁর কালে শান্তিনিকেতনে 'শিক্ষাসত্রে'র পত্তন হয়। পরে তা শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়ে আদ্যাবধি সেখানেই প্রতিষ্ঠিত আছে।"[৭] এখানে গ্রামের ছেলেরা কম খরচায় 'ম্যাট্রিক' পর্যন্ত পড়তে পারত। তাছাড়া কৃষি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্প, আদর্শ পল্লী সংগঠন ও পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজও এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই করার ব্যবস্থা করা হয়। তবে মূলত কৃষি শিক্ষার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ উৎসবে'এর উদ্বোধনী ভাষণে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন মন্ত্রী রেনুকা রায় বলেন,-" বর্তমানে কৃষিবিদ্যার খুবই প্রয়োজন। শুধু কৃষি নয়, হাতে-কলমে যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য। শিক্ষার সেইরকম একটি প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতন।"[৮] অসিত কুমার হালদার তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন- "তখন কবির ৬০ বৎসর বয়স। বিশ্বভারতীর প্রচার করে এলেন য়ুরোপে, এবং সেখানে অনেক বন্ধু পেলেন। আমেরিকার একটি ধনী মহিলা তাকে বরাবরের জন্য কিছু টাকা ধার্য্য করে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। রবিদা তখন রায়পুরের লর্ড সিংহের নিকট সুরুলের চিপ সাহেবের (নীলকর) প্রাচীন কুঠি- বহু জমি সমেৎ খরিদ করেছিলেন।"[৯]

শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনের দূরত্ব ছিল প্রায় এক মাইলের বেশি। বীরভূম জেলার এই স্থানে আগে জন কোম্পানির নীল চাষের বড়ো কেন্দ্র ছিল। নীল চাষ বন্ধ হয়ে যাবার পর

এই বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্থানটি কেনার পর ঐ জঙ্গলের মধ্যেই কিছুদিন ছিলেন, জঙ্গল পরিষ্কার করতে কিছুতেই তাঁর মন চাইছিল না। তাছাড়া শীতকালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীরা বনভোজনের জন্য সেখানে যেতেন, কেউ যেত ফলের লোভে কেউ যেত জঙ্গলের দৃশ্য আঁকার জন্য। পরে সেখানে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবী ঐ স্থানটি পরিষ্কার করে বাসোপযোগী করে নেন, এভাবেই শুরু হয় শ্রীনিকেতনের আয়োজন। পল্লী উন্নয়নের কাজে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠান। তৎকালীন বহুল প্রচলিত শাখাগুলিতে ডিগ্রী অর্জণের চেষ্টা না করে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাবার ইচ্ছপূরণের জন্য কৃষিবিদ্যার পাঠই গ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে গৌরগোপাল ঘোষ ও লেনার্ড এলমহার্স্টকে সঙ্গে নিয়ে পল্লী সংগঠনের কাজ শুরু করে দেন।

শ্রীনিকেতনের কথা বলতে গেলে লেনার্ড এলমহার্স্ট মহাশয়ের সম্বন্ধে অবসই কিছু কথা বলতে হবে। অসিত কুমার হালদারের স্মৃতিকথা অনুযায়ী তিনি প্রথম ভারতে এসেছিলেন ‘সাইমন কমিশনের’ সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আমলা হয়ে। তিনি ছিলেন কমিশনের ‘আন্ডার সেক্রেটারি’। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি সব ত্যাগ করে রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়েন এবং শান্তিনিকেতনে এসে একেবারে সাধারনভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি শ্রীনিকেতনের উন্নতি কল্পে যথেষ্ট অর্থ দান করেছিলেন। অন্য দিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্রজীবনী’-তে জানিয়েছেন- “... আমেরিকায় বাসকালে কবির সহিত লেনার্ডের পরিচয় হয়। ইনি বিলাতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আমেরিকায় যান; সেখানে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের গ্রামসংস্কার সম্বন্ধে

কথাবার্তা শুনিয়া তিনি এমনই আকৃষ্ট হন যে ভারতে আসিয়া একদিন কবির স্বপ্নকে মূর্তি দান করিবেন বলিয়া সংকল্প গ্রহণ করেন। ইংলন্ডে ফিরিয়া এলমহার্স্ট কবিকে পত্র যোগে জানান যে তিনি বিশ্বভারতীর গ্রামসংস্কার কর্মে যোগদান করিতে ইচ্ছুক; "[১০] লেনার্ড এলমহার্স্টের কবিকে লেখা চিঠির উত্তরে কবি জানিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর তৎকালীন অর্থ সঙ্কটের কথা এবং আমাদের দেশের সরকারেরও এই কাজে অর্থ সাহায্য করবার কোনও উৎসাহ নেই ফলে তাঁর কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবার প্রায় কোন সম্ভবনাই নেই। এলমহার্স্ট আবার সে চিঠির উত্তরে জানান টাকা সংগ্রহের জন্য কবিকে চিন্তা করতে হবে না গ্রাম-উন্নয়নের জন্য টাকার ব্যবস্থা করে তবেই তিনি ভারতে আসবেন। এলমহার্স্টকে এই অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মিসেস স্ট্রেইট, যিনি নিউইয়র্কে কবির সঙ্গে পরিচত হন এবং সেখানকার ধনী কন্যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলাপ করিয়ে দেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলি মানলে বোঝা যায় অসিত কুমার হালদারের স্মৃতিকথায় হয়তো ত্রুটি আছে। কারণ এ কথা হতো ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিসেস স্ট্রেইটের আগে থেকেই পরিচয় ছিল, তবে তাতে এ বিষয় স্পষ্ট হয় না যে তাঁর কথাতেই 'আমেরিকার একটি ধনী মহিলা' অর্থাৎ মিসেস স্ট্রেস তাঁকে 'বরাবরের জন্য কিছু টাকা ধার্য্য করে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি' দিয়েছিলেন, তা যদি হত তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলমহার্স্টের চিঠিতে অর্থ সঙ্কটের কথা বলতেন না। এলমহার্স্টই সম্ভবত মিসেস স্ট্রেইটকে উৎসাহ দিয়ে ঐ অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে মনে হয়।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে সমজের সাধারণ মানুষদের সমবায় পদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমে সকলের সার্বিক বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্য ১৩৪৫ সালে ২৩ অগ্রহায়ণ তৈরি করা হয় 'শ্রীনিকেতন- শিল্পভাণ্ডার'। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন- "আমার ইচ্ছা

ছিল সৃষ্টির এই আনন্দ-প্রবাহে পল্লীর শুস্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করবে, নানা দিকে তাঁর আত্ম-প্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে।”[১১] শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে কিভাবে নানা ‘পথ খুলে’ গিয়েছিল তা জানা যায় তার বিস্তারের ক্রমের দ্বারা। শ্রীনিকেতন আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় ১৯২২ এ, ঠিক তার পরের বছর এখানকার উন্নয়নমূলক কাজকে দুটি প্রধান শাখায় ভাগ করা হয়—শিক্ষা ও সম্প্রসারণ। ১৯২৭ সালে ঐ কাজ গুলিকে আরও ছোট ছোট বিভাগে ভাগ করা হয় পরিচালনার সুবিধার্থে, যেমন- গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা-সত্র, কৃষি, শিল্প, সমবায়, প্রশাসন ইত্যাদি। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে যখন যেমন আর্থিক সহায়তা লাভ হয়েছে শ্রীনিকেতনের বিকাশও তেমন হয়েছে। কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গবাদি পশু পালন, খামার বাগান চাষ, জৈব সারের উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি। শিল্প শাখায় যুক্ত হয়েছে মৃতপ্রায় কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে হস্ত শিল্পের প্রশিক্ষণ, কাঁচামাল বিতরণ এবং বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। প্রশাসন ও গ্রামউন্নয়নের কাজ বিস্তার লাভ করেছে গ্রাম সমীক্ষা, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা, সমজকল্যাণ, ব্যধি নিরাময়, কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয় ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রাতমিক শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য তৈরি হয়েছে লোকশিক্ষা সংসদ, বালিকা বিদ্যালয়, নৈশ্য বিদ্যালয় এবং এই সব কাজের প্রচার ও সহায়তার জন্য তৈরি করা হয় ব্রতী বালক দল। সাধারণ মানুষদের সমবায়নীতির মাধ্যমে কাজ করার উৎসাহ জাগাবার জন্য গড়ে তোলা হয় শ্রীনিকেতন ‘ব্যাঙ্ক’। এ তো গেল প্রতিষ্ঠানিক অবস্থার কথা। সাধারণ মানুষ কেমন ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এই আত্ম-উন্নয়নে তার বিবরন দিয়েছেন সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়- “কুটিরশিল্প-বিভাগে সাধারণ-শ্রেণীর বহু লোক, তাঁত, কাঠ, চামড়া ও মাটির কাজ শিখে নিচ্ছে।

গ্রামের তাঁতীরা 'শিল্পভবনে'র সাহায্যে কাপড় বুনে জীবিকা অর্জন করছে। গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাও নানা রকম শিল্পচর্চা করবার সুযোগ পাচ্ছে শ্রীনিকেতনের সংস্রবে থেকে।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে 'লোকালয়কে আবার সমগ্র করে' তুলতে, 'বিশিষ্টে, সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহর-গ্রামে মিলিয়ে-মিলিয়ে সম্পূর্ণ' করতে। শ্রীনিকেতন সম্পর্কে ভাষণ দেবার সময় বারবার এই দশের একত্র পরিশ্রম ও একত্র বিকাশের কথা বলেছেন- "মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখিতে পারি।"[১৩] শ্রীনিকেতনের প্রাঙ্গন তাই ছিল মুক্ত শিক্ষাঙ্গন, ছোট বড় সকলের সেখানে শিক্ষা গ্রহণের আয়োজন ছিল। এ কাজের জন্য তিনি অনেকবার সরকারী দানের জন্য আবেদন জানালেও কোনও সাহায্যই পাননি। এর জন্যেও তাঁকে যথেষ্ট কটূ কথা শুনতে হয়েছিল। তবুও সাধারণ মানুষের উন্নতির কথা মনে রেখে নিজের আদর্শে তিনি অবিচল ছিলেন। গ্রাম-শহরের দূরত্ব মোচনের জন্য মোটামুটি যা যা ব্যবস্থা করনীয় ছিল, তাঁর স্বহৃদয় স্বেচ্ছা সেবকগণের দ্বারা শ্রীনিকেতনে তার প্রায় সমস্তই সম্পাদন করা হয়েছিল। সময় যত এগিয়েছে শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়নের পরিধিতে এক এক করে আরও বেশি গ্রাম যুক্ত হয়েছিল এবং উন্নতি লাভ করেছিল। বিশ্বভারতীর সহায়ক রূপে শ্রীনিকেতনকে তিনি ঠিক যে ভাবে কল্পনা করেছিলেন কিছু ভুলত্রুটি, মনমালিন্য থাকলেও তার মূলগত আদর্শ তাঁর মৃত্যুর পরও অনেক দিন পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। আর এখানেই রবীন্দ্রভবনার সার্থকতা।

----------তথ্যসূত্র----------

১. শান্তিদেব ঘোষ, ‘জীবনের ধ্রুবতারা’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২২ শ্রাবণ ১৪০৩, পৃ ২৯

২. শান্তিদেব ঘোষ, ‘জীবনের ধ্রুবতারা’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২২ শ্রাবণ ১৪০৩, পৃ ৩০

৩. শান্তিদেব ঘোষ, ‘জীবনের ধ্রুবতারা’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২২ শ্রাবণ ১৪০৩, পৃ ২৯

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ৯

৫. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ৬১

৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ১১২

৭. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ৬২

৮. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ১৭২

৯. অসিতকুমার হালদার, ‘রবিতীর্থে’, কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ১৩০

১০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭ পৃ ১১১

১১. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ৬২

১২. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ৬২

১৩. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ৬৩

আশ্রমবাসী মানুষদের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভালো শিল্প যখন ক্লিষ্ট জীবনের নির্মোক ভেঙে আত্মকে উপলব্ধি করতে শেখায় তখন আমরা শিল্পের মাধ্যমে শিল্পীর কাছাকাছি পৌঁছতে চেষ্টা করি, বুঝতে চেষ্টা করি তাঁর জীবনযাপন, খুঁজে পেতে চাই শিল্প উৎসকে। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে' বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাবধান বানী শোনালেও শিল্পী মন থেকে সম্পূর্ণ শিল্পীমানুষকে নতুন করে আবিষ্কার করার আগ্রহে আমাদের কোথাও ছেদ পড়েনা। সেকারণেই হয়তো রবীন্দ্রালোচনা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রজীবনের খুঁটিনাটি তথ্য জানবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তার সবটাই অকারণ আবেগ নয়। তিনি এমন একজন সাহিত্যিক যিনি শিল্পকে বহু আঙ্গিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনযাপনে ছিল তার প্রভাব। তাই সাহিত্যিক-শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে জেনে আমাদের রবীন্দ্রচর্চা শেষ হওয়া উচিত নয়। তাঁর শৈল্পিক জীবনরীতি প্রত্যক্ষ ভাবে না জানলে মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্নদাশংকর রায় যখন তাঁকে 'জীবনশিল্পী' আখ্যা দেন, তার ব্যখ্যায় আমরা কেবল কাব্যের শিল্পরূপই বুঝিনা, সাহিত্যের সমান্তরালে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতির দ্বান্দিকতার মধ্যেও কিভাবে তিনি জীবন ও কর্মের শিল্প মূর্তি রচনা করেছেন তার কথাও বুঝি। দান্তের জীবনকথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের প্রাত্যহিক কাজে উভয় ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁর একই প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।'-একথা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও

প্রযোজ্য। দৈনন্দিন আলাপচারিতায়, অতিথিবাৎসল্যে, বাসাবদলের আপন খেয়ালে, বিচিত্রগামী বহুমুখী সৃষ্টি কর্ম, পোশাক পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে, মননে-চিন্তনে নিজেকে একটু বিকশিত করেছেন তিনি। সেই ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আরো একবার ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই আলোচনা।

মানুষকে তিনি বড়ো সহজে আপন করে নিতে পারতেন। তাঁর কাছে সামাজিকতার অর্থ ছিল মানবধর্মের প্রাধান্য। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া'-র স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন-'রবিকাকা একদিন বললেন, রাখিবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে।' উৎসবের দিন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তিনি রাখী পরিয়ে ছিলেন। মুসলমান সহিসদের রাখী পরিয়ে কোলাকুলি করে সেদিন তিনি পা বেড়িয়েছিলেন চিৎপুরের বড়ো মসজিদের দিকে। মসজিদে ঢুকে মৌলবীদের রাখী পরিয়ে তবে বাড়ি ফিরে ছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় সামাজিক আন্তরিকতার এমন প্রচুর দুঃসাহসিক প্রকাশ তাঁর বহু কাজে পাওয়া যায়। তাঁর সামাজিক সহৃদয়তার খুব বড়ো একটি দিক প্রকাশ পায় তাঁর চিঠিপত্র লেখার অভ্যাসে। দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি আসতো তাঁর কাছে নানারকম দাবী নিয়ে। প্রতিটা চিঠি তিনি স্বহস্তে খুলে পড়তেন। ব্যক্তিগত চিঠি গুলির উত্তর নিজেই দিতেন এবং এ ব্যাপারে কোনো বাছবিচার করতেন না। যেমন কেউ হয়তো ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের কাছে দুরারোগ্য রোগের ওষুধ চেয়ে পাঠিয়েছে। কেউ লিখেছে অনূঢ়া কন্যার জন্য সুপাত্র দেখে দিতে। কেউবা নিজের জন্যই পাত্রী চেয়ে লিখেছেন-প্রথমা স্ত্রী কে আর সহ্য করতে পারছেন না। কবিতার বই ছাপিয়ে কেউ আবার অনুরোধ করছেন রবীন্দ্রনাথ যেন বিদেশে চিঠি লিখে তার নোবেল পাবার ব্যবস্থা অবশ্যই করে দেন। শুভ বিবাহের বা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কয়েক লাইন আশীর্বাণী লিখে দেবার

অনুরোধও আসতো প্রচুর। এক ব্যক্তি আবার দেড়লক্ষ টাকা পত্রপাঠ পাঠাতে নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন, ঐ টাকা না পেলে তিনি সংসারের ভারমুক্ত হয়ে সাহিত্যে মন দিতে পারচেন না। তা না হলে তার মতো প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটলে যে মহা ক্ষতি হবে সেজন্য কবিকে সারা পৃথিবীর কাছে একদিন জবাবদিহি করতে হবে। এমন কত পাগলের চিঠিই না আসতে তাঁর কাছে। একটি ছোট্ট মেয়ে নাম শান্তা কবিকে একবার চিঠি লিখেছিল সে এক লাইন কবিতা লিখেছে 'সারাদিন বসে আছি জানালার ধারে' কিন্তু পরের লাইন আর কিছুতেই ছন্দে মেলাতে পারছে না। তাঁর অনুরধ রবীন্দ্রনাথ যেন বাকিটা মিলিয়ে দেন। কবি জবাবে লিখলেন- "সারাদিন বসে আছি জানালার ধারে,

উদাস ফাগুন হাওয়া ডাকিছে আমারে।

বাইরে চাঁপার বোনে লাগে সেই হাওয়া-

মনে মনে জাগে সাধ বসে গান গাওয়া !

—লিখেই কি মনে হল কবির ! আর এক লাইন বানালেন তিনি- 'আকাশে মেঘের তরী চলে ভেসে ভেসে' তারপর লিখলেন, এটার সঙ্গে এক লাইন তুমিও মিলিয়ে নিও।"[১] ছোটো শিশুদের এই রকম আবদার গুলিকেও তিনি ছোটো করে দেখতেন না। বরং যে কোনও কাজ তারা করতে চাইলে সবসময় উৎসাহ দিতেন। একবার বাংলাদেশের পল্লী গ্রামের এক প্রৌঢ়া ধাত্রী আঁকাবাঁকা অক্ষরে অসুস্থ কবির জন্য পাঁচন তৈরির উপকরণ লিখে চিঠি পাঠিয়েছেন। সে সময় শারীরিক দুর্বলতার কারণে পড়তে বা লিখতে পারতেন না তিনি। এ চিঠি শোনার পর হঠাৎই কাগজ কলম চেয়ে নিলেন। রানী চন্দ স্মৃতিকথায় লিখছেন, কবিকে চিঠি লিখতে বাধা দেওয়ায় বললেন-"না এ চিঠির জবাব আমি নিজের হাতে দেব" আরো বললেন "কোন্ এক অজানা

গাঁয়ের অচেনা মেয়ে আমার অসুখের খবর পেয়ে উতলা হয়ে ওষুধ লিখে পাঠিয়েছে, কি, না, আমি ভালো হব। কত মমতা! তোরা কারো সেন্টিমেন্টের মূল্য দিতে জানিস নে।"[২] কখনো আবার কষ্ট পেতেন কারো অকৃতজ্ঞতায়। সাংসারিক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে এমন সব চিঠিকে বাজে চিঠিই বলতে হয়, বিরক্ত আসে শ্রদ্ধাতো দূরস্থান। কিন্তু কবি এগুলিকে কখনো তুচ্ছ মনে করতেন না। এমন ছোট ছোট ঘটনা বিচার করলে তাঁর সামাজিক সৌজন্যবোধ ও সহমর্মিতার পরিচয় মেলে।

দৈনন্দিন আলাপচারিতায়ও রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক কথনরীতির প্রভাব আছে। যেমন-তেমন করে কথা বলা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে 'কথা বলা'ও আর্টের পর্যায়ভুক্ত, যা শিখতে হয়। ছোট-বড়ো, কাজের-অকাজের সব কথাতেই তিনি সচেতনভাবে সুনির্বাচিত শব্দমালার প্রয়োগ ঘটাতেন। তাঁর সুললিত ছন্দায়িত কণ্ঠস্বরে সাধারণ আটপৌরে কথাতেও অদ্ভুত মাধুর্য লেগে থাকতো। প্রাত্যহিক ব্যবহৃত অভ্যাস-মলিন ঘরোয়া প্রতিশব্দ বা খেলো অপশব্দ তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। তাঁর ভাষা ছিল আগাগোড়া সাহিত্যমন্ডিত-তা সে শব্দ সম্পদেই হোক বা বাক্-ভঙ্গিমায়, অথবা ভাব ব্যাঞ্জনায়! যে ভাষা দ্বারা তিনি প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা মেটাতেন তা পরম বিস্ময়কর। তাঁর আশেপাশে যাঁরা থাকতেন প্রত্যেকের স্মৃতি কথাতেই এমন তথ্য পাওয়া যায়।

বিশেষত কৌতুক করবার সময় তাঁর ভাষা আরও জমজমাট হতো। পুত্র, পুত্রবধূ, বন্ধু, ছাত্র, ভৃত্য কেউ তাঁর কৌতুকের তালিকা থেকে বাদ যেতো না। তবে কাউকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে মজা করতেন না। একবার একটি পত্রিকার বিষয়ে বললেন–'একদা সম্পাদক ছিলাম আমি এই পত্রের।' উপস্থিত একজন জিজ্ঞাসা করল 'অমুক কি এই পত্রিকার সহ সম্পাদক

ছিলেন?' সঙ্গে সঙ্গে কবি উত্তর দিলেন, 'সহ কি দুঃসহ বলতে পারি না, তবে ছিলেন মনে হচ্ছে।' তাঁর রসিকতাই ছিল এমন উপভোগ্য। কথার সঙ্গে লাগসই কথা বলে, সমধর্মী শব্দ বসিয়ে রস সৃষ্টি করা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি। **যামিনীকান্ত সোম লিখেছেন একবার পায়ের তলায় হাত বুলতে বুলতে বললেন, 'চরণ-কমল' শব্দটার আসল মানে আজ বুঝলেন। চরণ কমল না হলে কি আর মৌমাছি হুল ফোটাত। ব্যথা পেয়েও মজার এমন বিশ্লেষণ তিনিই করেতে পারতেন।** সব সময়ের ভৃত্য বনমালীকে একদিন ফরমাশ করলেন তাড়াতাড়ি চা করে আনতে। কিন্তু চা আনতে দেরি হচ্ছে, বিরক্ত কবি বললেন-'চা-কর বটে কিন্তু সু-কর নয়'। ইতি মধ্যে বনমালী হাজির। তিনি কৃত্রিম ক্রোধে বললেন- 'তুই বোধ হয় জানিস না যে তোর অতুলনীয় অকর্মণ্যতায় আমি খুব বেশী পুলকিত হইনি?'[৩] কেবল বনমালী নয় উপস্থিত সকলেই এ রসিকতা বুঝতে পারলেন। সুধাকান্ত বাবুর মাথার বিরল কেশ দেখে কবি মন্তব্য করলেন- তোর শিরোদেশ যে ক্রমেই মেঘমুক্ত দিগন্তের আকার ধারণ করছে রে।' সুধাকান্ত বাবু সবিনয়ে বললেন 'আমার বাবারও ঐ রকম হয়েছিল শেষ জীবনে।' কবি হাসতে হাসতে বললেন 'তাইতেই বুঝি শিরোধার্য করেছিস ওটা?'।[৪] তিনি 'গোলমাল', 'ধাপ্পাবাজ' জাতীয় অশিষ্ট শব্দের বদলে 'কোলাহল', 'প্রতারক' ইত্যাদি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। গালাগালি বা আদিরসাত্মক রসিকতার কথা তো তিনি ভাবতেই পারতেন না। বড়জোর এটুকই বলতেন যে –'মন্দলোক হলে এ অবস্থায় তালব্য শ'য়ে আকার দিয়ে বসতো।' 'বাংলিশ' মিশ্রনে কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। নিত্যদিনের অবশ্য প্রয়োজনীয় ইংরেজি কথার বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতেন- 'থার্মোমিটার' থেকে 'জ্বরকাঠি', 'children's cyclopedia' থেকে 'শিশুভারতী' ইত্যাদি। কলকাতার রাস্তাগুলির নাম দিতেন 'এসপ্ল্যানেড' হল 'গড়চত্বর', 'রাসবিহারীঅ্যাভেনিউ' হল

‘রাসবিহারী বীথি’ ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে যা অশিষ্ট, অশুচি তা জীবনে বাচনে সর্বত্রই তিনি এড়িয়ে চলতেন। তাঁর কথনরীতির প্রত্যুতপন্নমতিত্ব, সুমার্জিত রসিকতা লক্ষ করলে তাঁর মননরীতিরও হদিশ পাওয়া যায়।

অসিতকুমার হালদার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘুম ছিল ভীষণ অল্প, তার দৈনন্দিন কর্মসূচী আরম্ভ হত ভোর চারটে থেকে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনও ঋতুতে, কোনও কারনেই এই নিয়মের অন্যথা হত না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বলতেন সূর্য তাঁর মিতা তাই ভোর বেলা একই সঙ্গে তিনি উঠে পড়েন। কেবল অসিতকুমার হালদার নন রানী চন্দ, ক্ষিতিমোহন সেন, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ সকলেই স্মৃতিকথায় সে সম্পর্কে জানিয়েছেন। প্রতিদিন ব্রহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে পূর্ব দিকের জানলা খুলে তিনি উপাসনায় বসতেন পদ্মাসনে। তারপর গাইতেন নতুন লেখা গান অথবা পুরাতন প্রিয় কোনও ব্রাহ্ম সঙ্গীত। সে সময় তাঁর মুখে অপূর্ব প্রশান্তির কান্তি দেখা যেত। যারা দেখেছেন সে রূপ তাঁরা সমৃদ্ধ হয়েছেন। প্রতিদিন ভোরে ও রাত্রে বেশ কিছুটা সময় তিনি চুপ করে বসে ভাবতেন, এই সময়টা ছিল তাঁর নিজেকে জানার সময়। তাঁর কথায় ‘ছোট আমি’র সঙ্গে ‘বড় আমি’কে মিলিয়ে নেবার সময়।

প্রাত্যহিক দিনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও তিনি স্বতন্ত্র মর্জিতে চলতেন। কি খাদ্যবস্তু বিচারে, কি রন্ধনপ্রণালী বিচারে, কি আহার-গ্রহণ কৌশলে সবদিকেই তাঁর অনন্য বিশেষত্ব ধরা পড়ত। শুধু তাই নয় আহার্য বস্তু নিয়ে নানা সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও তিনি কসুর করেননি, প্রাতরাশ থেকে রাতের খাওয়া পর্যন্ত হরেক রকমের পরীক্ষা চলতে থাকত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা নানা স্মৃতিকথায় তাঁর খাদ্যাভ্যাসের এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায়,

যা থেকে মানুষ রবীন্দ্রনাথের অনেক অজানা ব্যক্তিরূপের সন্ধান মেলে। খেতেন অতি অল্প, তাই বলে কম খাবার তাঁকে দেওয়া চলত না, তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। শ্বেত পাথরের থালায়-বাটিতে গুছিয়ে নানারকম পদ পরিবেশন করলে তিনি খুশি হতেন। আগে বাটির ঢাকনা খুলে দেখে নিতেন কি আছে, তারপর কে মাংস ভালোবাসে তার বাড়িতে পাঠালেন সে বাটি, কে মাছ ভালোবাসে তার কাছে গেল মাছেরবাটি। কারো জন্য চপটা, কারো জন্য পায়েসটা, এমনি করে প্রায় সব বিলি হয়ে যেত। কাছে কেউ থাকলে তাকে বসিয়ে খাওয়াতেন। খাইয়ে, খাওয়া দেখে তিনি খুব তৃপ্তি পেতেন। আহার ব্যাপারে প্রচলিত রীতি বেশীরভাগ সময় মানতেন না। হয়তো গোড়াতেই খেতেন খানিকটা পায়েস,তারপর খেতেন দুচারটি আলুভাজা, একটু মোচারঘন্ট, তারপর একটু ভাত, অবশেষে খেতেন খানিকটা ঝোল দুটো লুচি। খাদ্যাভ্যাসের এমন ব্যতিক্রম সম্পর্কে একবার নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে ক্রমান্বয়ে আহার অভ্যাসের গোঁড়ামি মাত্র। "আমি মনে করি, শরীর-প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—সেটা অভ্যাসের অন্ধতায় ভুলে বসে থাকি বলেই আমরা এক-একটা রীতির দাসত্ব করে চলি।"[৫] তাঁর মতে আমাদের দেশে দারিদ্র্য আছে ঠিকই কিন্তু আমাদের অপুষ্টির জন্য বেশী দায়ি আমাদের অবৈজ্ঞানিক খাদ্যরীতি। বেছে নিতে জানলে কম দামেও 'সারবান খাদ্য' পাওয়া সম্ভব। আবার খাদ্য দ্রব্যের উপকরণগুলির গুনাগুন সম্বন্ধে সচেতনতা থাকলে, খাদ্য তৈরির সঠিক উপায় দ্বারাও পুষ্টির ঘাটতি মেটানো যায়। তাঁর চা খাবার অভ্যাসও ছিল বড়ো মজার। নামেই চা আদতে কেটলি ভর্তি গরমজলে কয়েকটি মাত্র চা-পাতা, সামান্য একটু রং হল কি না হল তারই খানিকটা ঢেলেনিতেন আধপেয়ালা, বকিটা ভর্তি করতেন দুধ দিয়ে,তাতে মেশাতেন দু-চামচ চিনি। গরম পানীয় কিছু একটার দরকারেই

যেন চা খাওয়া। 'চীনে-চা'পাতাই তিনি পছন্দ করতেন। গরমজলে ভিজলে সেগুলি যেন ফুলের মতো পাপড়ি মেলতো, তিনি বলতেন 'বেল-জুঁই'।

একটানা কোন খাবারই বেশিদিন তাঁর পছন্দ হতো না। প্রায় কোনো খাবারের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিলনা, কেউ নতুন কোনো খাদ্য নিরীক্ষার সম্বন্ধে বললেই সেকথা তাঁর মনে ধরতো । একবার এক পণ্ডিত অতিথি এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে,কথায়কথায় শাস্ত্র-পুরাণের নানা আখ্যানের উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝালেন হবিষ্যান্নই সঠিক আহার্য বস্তু। অতিথি চলে যেতে বললেন, "ইনি যা বলে গেলেন ঠিক কথাই,আমাদের দেশ গরম দেশ। এ দেশে দেহমন ঠিক রাখতে হবিষ্যান্নই একমাত্র আহার হওয়া উচিত। কাল থেকে আমাকে তাই দিয়ো বউমা।আমি কিছুকাল থেকেই স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম যা খাচ্ছি তা আমার দেহ ঠিকমত নিতে পারছেনা। অথচ বুঝতে পারছিলাম না কি করা যেতে পারে। এবারে ঠিক আহার্য বস্তুটির সন্ধান পাওয়া গেল।"[৬] কুমোর বাড়ি থেকে এক ঝুড়ি 'সদ্য-পোড়া লাল মাটির মালসা' আনানো হল,রান্না হল হবিষ্যান্ন। তা খেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে তিনি বললেন-"এই এতদিনে ঠিকটি হল। মাছ মাংস সাত-পাঁচ জিনিস, এতে করে পাকযন্ত্রের উপর চাপ দেওয়া হয়,অপকারই ঘটে শারীরের। এই খাবার খেয়ে বেশ বুঝতে পারছি, কাল হতে খুব ভালো বোধ করছি আমি।"[৭]

কিছুদিন বাদে তাঁর এক বিদেশী বন্ধু উপদেশ দিলেন ডিমে আছে সব খাদ্যগুণ, ওটাই আসল খাদ্য। হবিষ্যান্নর বদলে এল কাঁচা ডিম। সকাল বিকাল পেয়ালায় ডিম ভাঙেন একটু নুন-গোলমরিচ দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেন। আবার কিছুদিন যেতে না যেতে এলেন এক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ, বললেন-নিমপাতা সর্বরোগনাশক, রোজ কিছুটা করে খেলে শরীর সুস্থ থাকবেই। ব্যাস্, প্রতিদিন বড় একটা কাঁচের গ্লাস ভর্তি থকথকে ঘন সবুজ নিমপাতার রস

খেতে শুরু করে দিলেন। তাঁর খাবার তৃপ্তি দেখে মনে হত যেন পেস্তা বাটা খাচ্ছেন। বলতেন- "কি ভালো জিনিস এটা। এ খেয়ে অবধি আমি এত ভালো বোধ করছি, এমনটি কখনো করিনি। বললেন বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়; বেশি কেন ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়।"[৮]

একবার সেবাগ্রাম থেকে একজন এলেন। তিনি বললেন বৃদ্ধলোকেদের জন্য রসুন খুব উপকারী, তাতে হাতে-পায়ের বাতের বেদনার ও আরো বহু রোগের উপশম হয়। তারপর থেকে প্রতিদিন ডেলা ডেলা বাটা রসুন খেতে শুরু করলেন তিনি। এখানেই শেষ নয় তাঁর খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা। এক বিদেশী ডাক্তার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, ডাক্তারের মতে সব সবজি কাঁচা খাওয়া উচিত, আগুন জ্বালিয়ে রান্না করলেই সবজির পুষ্টিগুন নষ্ট হয়। পরদিন থেকে আগের ব্যবস্থা বদলাতে হল। সব কুচনো কাঁচা সবজি এল কবির আহার হিসাবে, লাউ কুমড়ো 'মায় আলু পর্যন্ত'। সব খেলেন হাসি মুখে,বললেন-"আজেবাজে সতের রকমের তরকারি-এ রাঁধতে বাড়তে তো কম ঝঞ্ঝাট নয়। অথচ কি উপকার এতে? তার চেয়ে কাঁচা সবজি কেটে কুচিয়ে খাও, একটু নুন দাও,লেবুর রস দাও-ব্যস্। খেতেও সুস্বাদু, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। এখন থেকে আমি এই খাব।"[৯]

সবচেয়ে মুশকিল হল যখন এক গুজরাটি অতিথি এসে বললেন ক্যাস্টর অয়েলের ময়ান দিয়ে পরোটা খেলে জীবনে আর ডাক্তার দেখাতে হয় না। সে কথা শুনে ক্যাস্টর অয়েলের পরোটাও উপাদেয় মনে করে নিশ্চিন্তে খেতে শুরু করলেন। এদিকে একা একা খাবার খাওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ,কাছে যে থাকে তাকে তিনি ভাগ দেন। কিন্তু ক্যাস্টর অয়েলের পরোটা শুরু হতেই সকলে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন কবির আহারের সময়। সকলে কেবল

মনে মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন নতুন কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর, যিনি সত্বর এসে অন্য একরকম খাবারের গুণাগুণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন। অথচ কবির কোনো হেলদোল নেই, পরোটা খেয়ে বললেন-'এই এতদিনে ঠিকটি হল-যেমনটি নাকি আমি চাইছিলাম।' ব্যক্তিজীবনে কোনো কিছুর প্রতি অতি আসক্তি কিংবা ছুঁৎমার্গ যেমন তিনি এড়িয়ে চলতেন খাওয়ার বিষয়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাছাড়া সৃষ্টি নিয়ে তাঁর অনবরত ভাঙাগড়ার মতোই খাদ্যাভ্যাসেও তাঁর খেয়ালি-সৃষ্টিশীল কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিদিনের পোশাক হিসাবে তিনি ঢিলাঢালা পায়জামা, পাঞ্জাবী অথবা আলখাল্লা পছন্দ করতেন। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে পোশাক ব্যবহারকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিতেন। বলতেন- শীতপ্রধান দেশের আঁটোসাঁটো পোশাক তাদের আবহাওয়ার উপযোগী, তাদের জীবন-যাত্রার পক্ষে সেটাই সঠিক। আবার বাঙালির সাজটা শ্রমসাধ্য কাজের পক্ষে অনুপযোগী হলেও বাঙালির বহিঃপ্রকৃতি ও মেজাজের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য পূর্ণ। স্বদেশী যুগে ধুতি-পাঞ্জাবিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন-"আমাদের দলের পান্ডা ছিলেন রবিকাকা...ইঙ্গবঙ্গসমাজে একটা পার্টি হবে, আমাদের নেমন্তন্ন। কী সাজে যাওয়া যায়। রবিকাকা বললেন, সব ধুতি-চাদরে চলো। সবাই পরলেন ধুতি পাঞ্জাবি সঙ্গে শুঁড়তোলা পাঞ্জাবি চটি। এখন খলি পায়ে কি করে যাই। তখনকার দিনে মোজা ছাড়া চলা, সে একটা ভয়ানক অসভ্যতা।" চটির তলায় সকলেই মোজা পরে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ কিছু দূর যাবার পর পায়ের মোজা খুলে ফেললেন, বললেন-"আর মোজা কেন, ও খুলে ফেলো; আগাগোড়া দেশী সাজে যেতে হবে।...সেই-যে আমাদের ন্যাশানাল ড্রেস নাম হল, তা আর ঘুচল না।"[১০]

উৎসব-অনুষ্ঠানে তিনি গরদের ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। এমনি সময় পরতেন লম্বা জোব্বা। বাইরে বের হবার সময় একটার উপর আর একটা জোব্বা চাপাতেন। ভিতরকার জোব্বা টা বুক-ঢাকা, পরাতন কুর্তা মতো বুকের উপর থেকে কোমর পর্যন্ত বোতাম লাগানো তার উপরেরটা গলা থেকে পা পর্যন্ত সবটাই খোলা। হরেকরকম জোব্বা ছিল তাঁর, যার বেশির ভাগই ছিল সিল্কের তৈরি। কমলা, গেরুয়া, সাদা, খয়েরী, বাদামী, ঘননীল, কালো, বাসন্তী, মেঘ-ছাই ইত্যাদি নানা রঙের। প্রকৃতির সঙে সামঞ্জস্য রেখে মাসে মাসে রং বদলে বদলে সাজতে তিনি পছন্দ করতেন। প্রকৃতির সঙ্গে এভাবেই যেন তিনি একাত্ম হতে চাইতেন। শীতের শেষে হঠাৎ একদিন বাসন্তী রঙের জোব্বা পরে বাইরে বসে আছেন। রাণী চন্দ এ ব্যাপার দেখে হাসতে হাসতে কারণ জিজ্ঞাসা করায় কবি বললেন, "বসন্তের আসার সময় হল যে। আমি যদি তাকে ডেকে না আনি কে আনবে বল্ ? তাই তো বাসন্তী রঙে সেজে বসন্ত কে আহ্বান করছি। দেখলি নে, একটু আগে এক পলকের জন্য দখিন-হাওয়া পরশ বুলিয়ে গেল। লিখছিলাম, উঠে জোব্বা বদলে নিলাম।"[১১] আবার মেঘ দেখে শিশুর মতো আনন্দ পেতেন। এই ঋতু ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু, তাই বর্ষায় পরতেন ঘননীল রঙের জোব্বা।

এক জায়গায় বেশিদিন তিনি থাকতে পছন্দ করতেন না। কারণে-অকারণে বাড়ি বদল করা ছিল তাঁর শখ,অদ্ভুত খেয়াল। শ্যামলীতে রয়েছেন-লেখাপড়া নিয়ে বেশ মেতে আছেন, হঠাৎ কি মনে হল, বললেন- 'ডেরা-ডান্ডা গোটাও-সব নিয়ে যাও পুনশ্চতে।'[১২] সঙ্গে জিনিসপত্র রওনা হয়েগেল। কবি এসে উঠলেন নতুন বাসায়। আশ্রমের এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে তিনি একবার অন্তত থাকেননি। প্রতিটি বাড়িতে উঠেই তিনি বলতেন- 'এ বাড়ি আমার পক্ষে ঠিক হয়েছে।' কিন্তু সপ্তাহ না ঘুরতেই মত বদল 'ভালোলাগছে না এখানে।' আবার মোট-ঘাট

সরানো হল উদয়নের কাছে বাগানের ছোট ঘরটিতে। এইভাবে বাড়ি বদল সকলের এত অভ্যস্ত হয়ে গেছিল যে এ বিষয় আর কেউ কোন প্রশ্ন করতো না।

তাঁর বাসাবদলের প্রয়োজনে উত্তরায়ণ কম্পাউন্ডের ভিতর অনেকগুলি বাড়ি তৈরি হয়েছিল, যার প্রত্যেকটিতেই কবি কিছু দিন করে বাস করেছিলেন। প্রথমে থাকতেন উদয়নে, খেয়াল হল একটা নিরিবিলি মাটির ধরে থাকবেন-তৈরি হল 'শ্যামলী'। মাটির কংক্রিট দিয়ে বানানো চমৎকার বাড়ি। দেখে বললেন- "হাঁ, এই ঠিক ঘর আমার। মাটির সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারিনা আমি-আমিজে মাটির খুব কাছাকাছি। এখানেই বাকি কটা দিন কাটবে আরামে।"[১৩] কবিতার বই লিখে নাম দিলেন 'শ্যামলী'। শ্যামলীর ছাদে দু-এক জায়গায় ফাটল ধরলো ফলে কবির জন্য তৈরি হল নতুন বাড়ি 'পুনশ্চ'। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঘরটা খুব উতপ্ত থাকতো। বাধ্য হয়ে চলেগেলেন বাগান ঘরে। খুব শখ করে তিনি বানিয়ে ছিলেন 'কোনার্ক', চারিদিকে খোলা কেবল মাথায় ছাদ, কাঁচে ঘেরা বাড়ি। সেখান থেকে দূর দিগন্ত পর্যন্ত পরিস্কার দেখা যায়। পূর্বদিকের লালবারান্দায় বসতে তিনি ভালোবাসতেন। পুনশ্চের লম্বালম্বি আরো একটি বাড়ি বানানো হয়েছিল সেখানেও ছিলেন কিছু দিন। শেষজীবনে রোগশয্যায় ছিলেন উদয়নের একতলার হল ঘরটিতে-তাতে air-condition ছিল। শান্তিনিকেতনে এই ছিল তাঁর সর্বশেষ বাস-গৃহ। বারবার বাড়ি বদলের এই অভ্যাস খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। এ বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন- "এক জায়গায় স্থানু হয়ে থাকার মধ্যে আছে একটা বৈচিত্রহীন স্থিতিশিলতা, যা মৃত্যুর নামান্তর। বারবার আবেষ্টনী পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিজেকে বারবার নূতন করে পাই। কোন ব্যাপারেই তাই আমার অভ্যস্ততা আসে না।"[১৪] নতুন কিছু তৈরি করতে গেলে পুরাতনকে

ভাঙতে হয়, তাই সৃষ্টি-রাজ্যে নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য বাসাবদলের মাধ্যমে এভাবই মনকে ভেঙে গড়ে নিতেন তিনি।

সারাদিন তিনি ব্যস্ত থাকতেন নানা কাজে। কখনো পড়তেন, কখনো লিখতেন, ছবি আঁকতেন কখনো, সবরকম কাজের মধ্যেও চলতো তাঁর সাহিত্যের সাধনা। একবার পাঠ অভ্যাস সম্বন্ধে অসিতকুমার হালদারকে বলেছিলেন-"কেবল পড়ে যা, ডিকসেনারি দেখিসনে;--আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাম্ বোধাদপিগরিয়সী।"[১৫] কোনো সৃষ্টির মাঝে দর্শক বা অতিথি এলে তাঁর সঙ্গে অবলীলাক্রমে ঘন্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন এবং তিনি চলেগেলে আবার তৎক্ষণাত সেইখান থেকেই লিখতে শুরু করতেন। বাইরের কোন হট্টগোল তাঁর চিন্তাসূত্রে আঘাত হানতে পারতো না। তাঁর সৃষ্টি বিষয়ক কোন অনুষঙ্গ, তা যতই ছোট হোক কখনো স্মৃতিভ্রষ্ট হত না। এ বিষয়ে তিনি বলতেন- 'যখন বাইরে নিষ্ক্রিয় থাকি, ভেতরে তখন কাজ চলতে থাকে -তাই যেই কলম ধরি, অমনি এগিয়ে আসতে পারি।' ছবি আঁকতেন নিজের ইচ্ছে মত। কোনো নিয়ম মানতেন না, বলতেন 'ওটা একটা খেলা'। একবার ছবি এঁকে তাতে কালি দিয়ে ভর্তি করতেন, আবার তাকে উদ্ধার করতেন। তাঁর মতে মানুষ যখন একবার ঘা খায় বা পড়ে যায়-একটা কিছু সাংঘাতিক ঘটে, তারপরে মানুষ যখন নিজেকে ফিরে তৈরি করে, তখনই তার একটা সত্যিকারের রূপ হয়, মানুষের জীবনটাকেও তিনি শিল্পের মত করে এমন ভাবেই দেখতে পারতেন। তাই নিজেকে কখনো খুঁজে পেতে চেয়েছেন ছবি আঁকার মাঝে, কবিতা, গান, নাটক, গীতিকাব্যে, কখনো বা অভিনয়ের মধ্যে। জীবনের ছোট ছোট অনুসঙ্গগুলি তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্যে। বলতেন-"ছড়িয়ে গেছি হে, যে পারবে কুড়িয়ে নেবে।"[১৬] আমাদের কাজ কুড়িয়ে নেওয়া। তাই কবির সৃষ্টির মধ্য থেকে বিন্দু বিন্দু ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথকে

জড়ো করার চেষ্টা করছি আমরা। তাঁর সারাজীবনটাই ছিল সাধনা। তিনি সাহিত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে। ব্যক্তি-মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানলে তবেই তাঁর সাহিত্যকেও সম্পূর্ণ রূপে নিজেদের জীবন-চর্যায় গ্রহণ করতে পারবো আমরা। নিজের সাধনার দ্বারা কৃতিত্বের সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করে তিনি হয়ে আছেন প্রকৃত বিশ্বমানবতার প্রতীক। তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা ছিল কত সাধারণ অথচ কত আনন্দের। কেবল তাঁর শিল্প-সাহিত্য নয়, তাঁর জীবন-যাপনের বৈচিত্র্যময় পথটিও সকলের জন্য শিক্ষণীয়। এমন একজন বিশ্বপথিককে ঘরোয়া মানুষ রূপে দেখতে সকলেরই আগ্রহ ছিল, আছে, থাকবে।

----------তথ্যসূত্র----------

১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০, পৃ ২৯-৩০।

২. রাণী চন্দ, ‘গুরুদেব’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, পৃ ১১৮

৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০, পৃ ৭৮।

৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০, পৃ ৭৯

৫. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০, পৃ ৩৮।

৬. রাণী চন্দ, ‘গুরুদেব’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, পৃ ১০৮

৭. রাণী চন্দ, ‘গুরুদেব’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, পৃ ১০৮

৮. রাণী চন্দ, ‘গুরুদেব’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, পৃ ১০৯

৯. ঐ

১০.অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ঘরোয়া’, রাণী চন্দ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ২৬-২৭

১১.রাণী চন্দ, ‘গুরুদেব’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, পৃ ৪৭

১২. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০, পৃ ৬৯।

১৩.নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০, পৃ ৭০।

১৪. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০, পৃ ৭১।

১৫. অসিতকুমার হালদার, ‘রবিতীর্থে’, কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ৬১

১৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ‘কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ’, বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০, পৃ ৬৬।

আশ্রমবাসী মানুষদের স্মৃতিকথায় শিক্ষকবৃন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কালে তিনি তপোবনের আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনকে সম্পূর্ণ ভাবে গুরুগৃহের আদলে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা হল তপোবনের যুগ অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে, ফলে এমন গুরুও দুর্লভ হয়েছেন যাঁরা জ্ঞান সাধনার জন্য সর্ব সুখ ত্যাগ করতে পারেন। সে সময় তিনি জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠিতে জানাছেন-"উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না।"[১] কিন্তু কেবল আক্ষেপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার মানুষ তিনি নন, তাই শেষমেশ এমন আদর্শের একজন-দুজন নয় একাধিক শিক্ষকগণকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন শান্তিনিকেতনের আঙিনায়।

শান্তিনিকেতনে একেবারে শুরুতে 'ছাত্র জোটানো' ছিল মূল সমস্যার বিষয়। সেখানে ভালো অধ্যাপক যে পাওয়া যাবে না সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভালো অধ্যাপকের অভাব হলনা, বরং তাঁরাই জোগাড় করে আনলেন ছাত্র। জগদীশচন্দ্র বসুকে অন্য চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন- "শান্তিনিকেতনকে 'একটা নির্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই-একজন ত্যাগ-স্বীকারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।'বোধ হয় তখনই ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের সহিত কথা বার্তা হইতেছিল।"[২] তারাই হলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সর্ব ত্যাগী অধ্যাপক। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ মোট পাঁচ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সেই প্রথম যুগে শিলাইদহ থেকে শিক্ষক হয়ে এলেন জগদানন্দ রায় মহাশয়, শিবধন বিদ্যার্ণব। জগদানন্দ রায় মহাশয়ের

সম্পর্কে স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন-"দীর্ঘ নাসা প্রসস্ত ললাট—পাতলাচাপা ঠোঁট—উজ্জ্বল চক্ষু শ্যামবর্ণ ওজস্বী চেহারা ছিল তাঁর। অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান এই দুই গভীর বিষয় নিয়ে তাঁর ছিল অধ্যাপনা। ...শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্মম নিয়ম-নিয়ন্ত্রক শিক্ষক। আশ্রমের শৃঙ্খলা তাঁর জন্যে সর্বদা রক্ষিত হতো। অঙ্কশাস্ত্র অনভিজ্ঞ পরীক্ষাসন্ত্রস্ত ছাত্রেরা তাঁর দ্বারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সাগর পার হতে পারত সহজেই। আশ্রমের সকল গুরুতর বিষয়ে রবিদা তাঁর পরামর্শ নিতেন।"[৩] এমনিতে তিনি খুবই বন্ধু বৎসল, স্বহৃদয় ও রসিক ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়মের নড়চড় তিনি হতে দিতেন না। এরপরে এসে যোগ দিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ মহাশয়। রেবাচাঁদ মহাশয় পড়াতেন ইংরাজি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ সম্পর্কে লিখেছিলেন-"ব্রহ্মবান্ধব আশ্চর্য পুরুষ ছিলেন, অল্পবয়সের মধ্যেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে ঘটেছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই কেসব সেনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে নববিধান সমাজে যোগ দান করেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দ্যশ্যে তারপর সিন্ধু দেশে যান। সেখানে রেবাচাঁদ নামে একটি সিন্ধি যুবক তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়। শিষ্যকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি রোমান-ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, কার্ডিনাল নিউম্যান-এর বই পড়ে তাঁর মত পরিবর্তন হয়। এই সময় 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' নাম নিয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।"[৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম তৈরির সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যথার্থ সুহৃদ হিসেবে পেয়েছিলেন। সে কারণে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে বলেছেন- 'উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।' কারণ আশ্রম বিদ্যালয় শুরুর সময় বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ তিনি কিছুই জানতেন না, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ই সে কাজের ভার স্বেচ্ছায়

গ্রহণ করেছিলেন। অদ্ভুত ব্যপার হল তিনি ধর্মত ছিলেন খ্রিস্টান কিন্তু তাঁর স্বভাবে ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া বসন পরতেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন একবারের ঘটনাক্রমে তাঁদের কুস্তি শেখার আখড়ায় এক পাঞ্জাবী পালোয়ান এসে তাল ঠুকতে লাগল। "তার বিপুল বলিষ্ঠ দেহ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে রইলুম, কারও সাহসে কুলোল না তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার সঙ্গে লড়াইতে নেমে যায়। সকলেই কিংকর্তব্য- বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখি উপাধ্যায় মহাশয়য় কৌপীন পড়ে সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি তাল ঠুকে পালোয়ানকে লড়াই করতে আহ্বান করলেন। বাঙালি সন্ন্যাসীর কাছেই শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবী পালোয়ানকে হার মানতে হল। আমাদের তখন কী আনন্দ!"[৫] ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আজ বেশীরভাগ মানুষ ভুলে গেছেন, কিন্তু তিনি না থাকলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্পিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম পূর্ণতা পেতনা। আজ অনেকেই হয়তো জানেন না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 'গুরুদেব' নামে সকলের কাছে পরিচিত, তা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়েরই প্রবর্তিত।

পরের বছর এলেন বাংলা পড়াবার জন্য শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের খুড়তুতো ভাই সুবোধচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শিলাইদহ থেকে জমিদারির কাজ ছাড়িয়ে আশ্রমে আনলেন সংস্কৃত পড়াবার জন্য। সুধীররঞ্জন দাস মহাশয় লিখেছেন-"হরিবাবু ছিলেন গৌর বর্ণ মার্জিত দেহ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।...গুরুদেবের নির্দেশ মত তিনি ছেলেদের জন্যে 'সংস্কৃতপ্রবেশ' লিখেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রধান একটি কাজ ছিল বাংলা অভিধান সংকলন। আজও মনে পড়ে, দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে কুয়োর ধারে খড়ের চালাঘরের পশ্চিমের জানালার কাছে রেখে হরিবাবু তাঁর বাংলা

অভিধানের জন্যে শব্দ সংগ্রহ করে পাণ্ডুলিপি লিখছেন। সে কাজের বিরাম ছিল না, শেষ ছিল না।"[৬] তৃতীয় বছরে এলেন সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম আলাপ হয় কবিতা লেখার সূত্রে। তাঁর বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর কবিতার খাতা কবিকে পড়বার জন্য দিয়েছিলেন। সে খাতা পড়ে কবির সন্দেহ মাত্র ছিল না যে, 'এই ছেলেটির প্রতিভা আছে', তবে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর তাঁর 'শান্ত নম্র স্বল্পভাষী সৌম্যমূর্তি, দেখে' কবির মনে হয় কেবলমাত্র লেখার ক্ষমতা নয় তাঁর মধ্যে শক্তিশালী মানবিক গুণও বর্তমান। সতীশচন্দ্র রায়ের বয়স অল্প হলেও কবি তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভাবাদর্শ নিয়ে উদার ভাবেই আলোচনা করতেন। তিনি লিখেছেন- "সে সময় আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা। আমার নতুন পাওয়া বালক-বন্ধুর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তাঁর স্বাভাবিক ধ্যানদৃষ্টিতে সমস্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ।"[৭] সতীশচন্দ্র রায় সংসারের দায়বদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ হতে চাননি, তাই জেনে শুনেই বি.এ. পরীক্ষা না দিয়ে বহু দারিদ্র সহ্য করেও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এসে যোগ দেন। তাঁর মৃত্যুর পর অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ও শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

নেপালচন্দ্র সেন ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বড়, সরল হাস্য রসিক বৃদ্ধ মানুষ। অসিতকুমার হালদার তাঁকে 'পুরোনো কালের মাষ্টার মশাই' বলে সম্বোধন করেছেন। "তিনি ছিলেন গল্পের রাজা। গ্রাম্য বৃদ্ধেরা যেমন সেকালের গল্প বলেন; এঁর মুখেও"[৮] তাঁরা সেই রকম মজার মজার গল্প শুনতে পেতেন। ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে সকলের কাছে 'ঠাকুর্দা' নামেই পরিচিত ছিলেন, তাঁর মিশুকে স্বভাবের জন্য। "ক্ষিতিমোহনের সরস-পরিহাস-নিপুণতার কথা সবাই জানেন। রবিদা তাই এঁকে খুব খাতির করতেন। দ্বিত্বার্থ ব্যঞ্জক কথা (Pun) বলায়

কবিও আমোদিত হতেন।”[৯] সে সময় আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রায় সব নাটকে দাদাঠাকুরের চরিত্রে তিনি অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করতেন। তিনি পায়ে হেঁটে নানা স্থান ঘুরতে খুব পছন্দ করতেন। এই ভ্রমনের সময়ই বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন দাদু, কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস, প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের দোঁহা। এই দোঁহা গুলি তিনি খুবই পছন্দ করতেন এবং সকলকে শোনাতেন। তাঁর সংস্কৃত ক্লাস সোনার জন্য কেবল শিক্ষার্থীরা নয় অধ্যাপকগণও আগ্রহী হয়ে থাকতেন। তিনি খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য গুলি বঝাতে পারতেন। তাঁর পড়াবার সময় মনে হতো যেন সাহিত্যের কল্পিত পরিবেশ কথার পটে ছবি হয়ে ফুটে উঠছে। মাঝে কিছু দিনের জন্য আঁকার ক্লাসের শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন নগেন আইচ মহাশয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ। তাঁর মতো সাধকের পক্ষেই সম্ভব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের খুঁটিনাটি সংগ্রহ করে অত বড় মাপের রবিন্দ্রজীবনী রচনা করা।

শান্তিনিকেতন আরম্ভের কিছু দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষা সংস্কার করতে গেলে আগে গ্রামের উন্নয়ন করতে হবে, তবেই স্বায়ত্ত শাসন ও স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। গ্রামীণ স্বনির্ভরতার মাধ্যমে স্বায়ত্ত শাসন লাভের কথা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম এমনভাবে ভাবতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে তখনকার সমাজ সংস্কারকগণ সেসময় এ ব্যপারে একেবারে উদাসিন ছিলেন। তার এই মহৎ ও কার্যকারী ভাবনার গুরুত্ব কেউ বিশ্লেষন করেননি। ফলত কেউ সাহায্য করতেও আগ্রহী হননি। তবে কেউ সহায়তা করল না বলে তিনি সময় নষ্ট করেননি, নিজের উদ্যোগেই

শুরু করেদেন ‘পল্লীসঞ্জীবনের’-এর কাজ। কিন্তু প্রকৃত নিঃস্বার্থ মানুষের সন্ধান করছিলেন। কারণ এ সময় তাঁর মনে হয়েছিল জমিদারির কর্মচারীরা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজগুলি করছে না। ঠিক এমন সময়ই তাঁর আলাপ হয় কালীমোহন ঘোষের ও সঙ্গে। “বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর গুরুদেব বুঝতে পারলেন, এই যুবকটি অন্তর থেকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক এবং গুরুদেবের পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে।”[১০] পল্লীউন্নয়নের ব্রতে দীক্ষিত এমন সুযোগ্য সহায়ক পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে শান্তিনিকেতন আসার জন্য আহ্বান জানালেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার তিনি একজন কাণ্ডারি। গ্রামন্নয়নের পাশাপাশি তিনি শিশু বিভাগে শিক্ষক হিসেবেও ক্লাস নিতেন।

বিশ্বভারতীর একেবারে শুরুর দিকে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন যথার্থ সংস্কৃতজ্ঞের খোঁজ করছিলেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ মহিতচন্দ্র সেন ও বিদ্যালয়-পরিচালক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল দুজনেই বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ফলত তাঁরা বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বলেন ও তাঁর অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কাশীতে টোলের শিক্ষা সমাপ্ত করে খুবই কম বয়সে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন শিক্ষা দানের আহ্বানে। সবচ্ছল পরিবারের সন্তান হওয়ায় আর্থিক ভাবনা তাঁর ছিলেন না, তাছাড়া শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা শুনে সেখানে আসার আগ্রহ তাঁর বেড়ে গিয়েছিল। কারণ শিক্ষা গ্রহণ কালে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির গ্রন্থাগারের নির্জন পরিবেশ তাঁর অত্যন্ত ভাল লাগতো, কর্ম জীবনেও এমন একটি পরিবেশ তিনি কল্পনা করেছিলেন। ঠিক সে সময়ই তিনি শান্তিনিকেতনে যাবার আমন্ত্রন পান।

তিনি জানিয়েছেন প্রথম দেখাতেই স্থানটি তাঁর ভাললেগে গিয়েছিল, তাঁর মনে হয়েছিল 'আমার মন যা চায় এ স্থানটি তাই।' আশ্রমের শাল ও তালের শ্রেনীতে পরিবেষ্টিত বাগানের মধ্যে, বহু স্থানে উপনিষদের বহু কথা উৎকীর্ণ অথবা লিখিত। যা তাঁকে আরও আকৃষ্ট করেছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সবচেয়ে বেশি উতসাহিত করেছিলেন যিনি, তাঁর নাম বিধুশেখর শাস্ত্রী। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'- এই কথাটিই বিশ্বভারতীর প্রাণ স্বরূপ, আর এই বেদমন্ত্রটি সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার দিয়ে ছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গে কেমন অতপ্রত ভাবে মিশে ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে বিশ্বভারতী হয়ে ওঠার মধ্যেও ছিল তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, সে কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখে গেছেন-"কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য-সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তাঁর ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।...জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তাঁর উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে।"[১১] এই সময় নিজের গ্রামে টোল খোলার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে বিধুশেখর শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনায় অনেকখানি মিল ছিল। তাঁরা কেউই গতানুগতিক শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের নানা বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অথচ কোনোও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই। দুজনেই নিজেদের ইচ্ছা মত বিদ্যার্জন করেছেন, যে জ্ঞান ছিল সুগভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। সর্বোপরি, আলাদা স্থানে বসবাস করলেও মোটামুটি একই সময়েই সম্পূর্ণ ভারতীয় আশ্রম শিক্ষার আদর্শে পরিচালিত একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কথা দুজনের

ভাবনাতেই এসেছিল। তাঁর জ্ঞানের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আশ্রমের আর্থিক দুর্দশার দিনেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলির জোগান দিয়ে গেছেন। একদিকে ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষা দিয়েছেন অন্য দিকে নিজেই ছাত্র হয়ে বৌদ্ধ দর্শন ও ইতিহাসের মদন সাধনায় মেতেছেন। শিখেছেন পালি, তিব্বতি, চিনা, জার্মান, ফরাসি ইত্যাদি ভাষা। এতো চর্চার পরেও তাঁর মনে সন্দেহ দানা বেধেছিল যে তিনি হয়তো যুগোপযোগী শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ছেন। নিজেকে যাচাই করার জন্য তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন এবং ব্যর্থ হলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু এতে ইতিবাচক দিকই দেখলেন, তিনি তাঁকে বুঝিয়ে বললেন তাঁর ভাগ্য খুব তাই তিনি ফেল করেছেন। কারণ একবার পাস করলেই পর পর এফ.এ., বি.এ., এম.এ., পাস করার চেষ্টা তাঁকে পেয়ে বসত, ফলত তিনি গতানুগতিক শিক্ষার পথে চলে যেতেন। তাতে তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষার ক্ষতি হত, বন্ধনে তিনি নিজেকে অত্যন্ত সাধারণ মনে করতেন। পরীক্ষা পাসের চেয়ে অনেক বড়ো কাজ বিশ্বভারতীতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন আশ্রমবাসীদের কাছে ছিল আদর্শ, কারণ আশ্রমের যেকোনও পরিস্থিতিতেই তিনি সহজে মানিয়ে নিতে পারতেন। শান্তিনিকেতনের অবস্থা নিয়ে তাঁর ক্ষোভ বা অভাব হয়তো ছিল না। থাকলেও স্নেহের প্রশ্রয়ে সে অভাব পূরণ করেছিলেন তাঁর পরম প্রিয় ‘গুরুদেব’ আর ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নগেন আইচ মহাশয়ের পর আঁকার ক্লাসের শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন অসিতকুমার হালদার মহাশয়। তাকে আশ্রমের নিয়ে আসার আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছিলেন “একজন sensitive শিল্পিকে আনচি আশ্রমে, তোমরা ওকে দেখো যাতে ওর মন লাগে।”[১২] তিনি শান্তিনিকেতন আসার পর আগ্রহী অঙ্কন শিক্ষার্থীদের শেখাবার ভার পড়ল তাঁর

উপর। পরবর্তীকালে আসেন নন্দলাল বসু। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নন্দলাল বসুর আলাপ হয়। বলাই বাহুল্য, তারপর তরুণ চিত্রশিল্পীর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা ও চিত্রে তার অনবদ্য প্রকাশ সহজেই আকৃষ্ট করে তাঁকে। পরিচয় যত গভীর হয়, দুই শিল্পী আরও কাছাকাছি আসতে থাকেন, বাড়তে থাকে শিল্পের আদান প্রদান। এ সময়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চয়নিকা'র জন্য সাতটি ছবি এঁকে দেন নন্দলাল বসু। তবে ছবিগুলি আঁকার আগে কবিতাগুলির ভাব অনুভব করার জন্য কবির কাছে বসে শুনলেন কবিতাগুলি, তারপর দিলেন রূপ। ছবিগুলি স্বভাবতই মুগ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঠিক গুণের সমদর করতে যেমন জানতেন তেমনি জহুরীর মতো একবার দেখেই গুণী ব্যক্তিদের চিনে নিতেও পারতেন। আর একবার গুণীজনকে আবিষ্কার করতে পারলেই শত অনটনের মধ্যেও তার বা তাঁদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি রাখতেন না। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় ছাত্রের দক্ষতা বুঝতেও তাই তাঁর সময় লাগেনি। নন্দলাল বসুর সঙ্গে পরিচয় গভীর হতেই তাঁকে তিনি আহ্বান জানান শান্তিনিকেতনের আশ্রমে, অঙ্গন শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য। বিশ্বভারতীর আরম্ভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নন্দলাল বসুর শান্তিনিকেতনে আগমন ও কলাভবনের কাজে যোগদান শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, একেবারে যোগ্য ব্যক্তির যথাযোগ্য স্থানপ্রপ্তি। তরুণ শিল্পীর তখন আর কতইবা বয়স হবে, কিন্তু গুনীর কদর গুণে বয়সে নয় এ কথা কবি আগেই বুঝেছিলেন। তাই ১৩২১ সালের ১২ ই বৈশাখ নন্দলাল বসুর শান্তিনিকেতনে আগমনের পরই তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। আলপনা আঁকা পদ্মফুলে সাজানো সুগন্ধিত সভাস্থলের মাঝে 'চন্দনচর্চিত ললাট'এ 'সলজ্জ নন্দলালকে' বসিয়ে স্বরচিত কবিতায় ("তোমার তুলিকা রঞ্জিত

করে ভারত-ভারতী-চিত্ত") আশীর্বাদ করে সেদিন তাঁকে সংবর্ধিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সময় থেকেই অঙ্কন শিক্ষাকে পাঠক্রমের অঙ্গ হিসেবেই স্থান দিয়েছিলেন। সে সময় অঙ্কন শিক্ষক ছিলেন ওঙ্কারানন্দ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছবি আঁকার ক্লাসের প্রথম ছাত্র হলেন মুকুলচন্দ্র দে এবং মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। বিশ্বভারতীর আরম্ভের আগেও তাঁর বক্তব্যে এই পরিকল্পনার কথা উঠে এসেছে –"বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে...।"[১৩] এরপর একে একে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন সন্তোষচন্দ্র মিত্র মহাশয়। তারও পরবর্তী সময় ১৯১৮ সাল নাগাদ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র হয়ে আসেন সুরেন্দ্রনাথ কর, আসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসু। অর্থাৎ এই ক্রম অনুসরণ করলে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের শুরু থেকেই অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি অঙ্কন শিক্ষাকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন এবং বিশ্বভারতীর সূচনা হওয়ার পর সে শিক্ষার ভীত আরও পোক্ত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ কর, আসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসু 'এই ত্রয়ীর যোগে' কলাভবনের পত্তন শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলাভবন প্রতিষ্ঠার অনেক দিনের স্বপ্ন পূর্ণ হল অন্য দিকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নবীন শিল্পী ত্রয়ীর জীবনেও একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। কবি তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাশ্রমকে মননশীলতা ও সৃজনশীলতার সামঞ্জস্যে গড়ে তুলতে চিয়েছিলেন। নিজের কবি সুলভ শিল্প রুচির আদলে যে আশ্রম তিনি নিজ চেষ্টায় শুরু করেছিলেন, তা সেই আরদ্ধ কাজে সহায়ক হিসাবে কাছে পেলেন নন্দলাল বসু ও আরও অনেককে। তবে নন্দলাল বসুর শান্তিনিকেতনে যোগদান 'রীতিমত মণিকাঞ্চন যোগ',

কারণ তিনি কেবল নিজের প্রতিভা প্রতিফলনেই থেমে থাকেননি, বরং আক্ষরিক অর্থেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য সহযোগী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চসজ্জা, অঙ্গসজ্জা, নাটকে প্রয়োজনীয় চিত্রপট ইত্যাদির আয়োজনের ভার তিনি স্বেচ্ছায় নিতেন এবং যৎসামান্য উপকরণে তা সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতেন পারতেন। বিশেষত রূপসজ্জার ক্ষেত্রে সামন্য বস্তু সহযোগে অসাধারণ সাজ তৈরি করতে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর ছিল অত্যন্ত সখ্য। দিনকর কৌশিক তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন-"নন্দলাল ছিলেন কলাভবনের প্রাণবিন্দু। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ খবর তিনি রাখতেন। অনেকেরই সঙ্গে চিঠি পত্রে যোগাযোগ রাখতেন, চিঠিতে ছবি এঁকে তাঁদের পাঠাতেন...। নন্দলাল ছাত্রছাত্রীদের দেখতেন পুত্রকন্যাদের মতো। তাঁরা অসুস্থ হলে সেবা করতেন, ওষুধ এনে দিতেন, পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। ছাত্ররাও কোনো সমস্যায় পড়লে সজা তাঁর কাছেই যেতেন উপদেশ নিতে।"[১৪] এর মাধ্যমেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার মূল স্রোতের সঙ্গে তাঁর সৃজনশীলতার ধারা মিশতে পেরেছিল।

আর যাঁদের কথা না বললে শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা সম্পূর্ণ হবে না তাঁরা হলেন নানা দেশ থেকে আগত বিশ্বভারতীর বিভিন্ন অধ্যাপকগণ। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রথম 'অভ্যাগত অধ্যাপক' হিসাবে সস্ত্রীক আসেন সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয়। তিনি চীনা ও তিব্বতী ভাষার ক্লাস নিতেন। তিব্বত থেকে বহু হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথি তিনি সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বসে তিনি আর্যদের প্রথম ভারতাভিযান বিষয়ে তাঁর গবেষণাকৃত মৌলিক বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সে ক্লাস শুনতেন নিয়মিত। তিনি তাঁর গভীর গবেষণা লব্ধ বিষয়গুলি এত সরল ভাবে তুলে ধরতেন যে সকলের

কাজেই তা বোধগম্য হয়ে উঠত। চার্লস এন্ড্রুস ও উইলিয়াম পিয়ারসন দুজনেই গীতাঞ্জলির অসামান্য কবিতাগুলির গুণমুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন। চার্লস এন্ড্রুস পরে ভারতে এসেছিলেন তাঁকে গ্রামোন্নয়নে সাহায়তা করতে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে ইংরাজিও পড়াতেন। উইলিয়াম পিয়ারসনের সঙ্গে ইংল্যান্ডেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয়েছিল। তিনি কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ডের ভাব ও ভাবনা যেনে সে বিষয়ে আগ্রহী হয়ে যোগ দিতে এসেছিলেন বিশ্বভারতীতে। অমিয়কুমার সেন অনুবাদ করেছিলেন পিয়ারসনের লেখা 'শান্তিনিকেতন' বইটি। তাতে তিনি লিখেছেন-"তারার আলোতে পাহাড়ের উপর যেমন করে ছায়া নামে তেমনি করে চারিদিকে নীরবতা নেমে এল। আর সেই নিস্তব্ধতায় আমি যেন উপলব্ধি করলাম, এ জায়গাটির নাম 'শান্তিনিকেতন' রাখা হয়েছে কেন। এ যেন প্রকৃতই শান্তির নীড় বলে বোধ হল।...আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম যে এই আশ্রমেই আমার আত্মোপলব্ধির উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া যাবে এবং এই আশ্রমেই আমি বাংলাদেশের হৃদস্পন্দন আনুভব করতে পারব।"[১৫] চেকস্লভাকিয়া থেকে পন্ডিত উইন্টারনিজ। ইনি সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়নের নানা বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ব আলোচনা খুব জমে উঠত। ইউরপ থেকে এসেছিলেন ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশ, তাঁর গবেষনার বিষয় ছিল গথিক বা বাইজান্তাইন আর্ট। তাই 'আদিম ভাবের' চিত্র তাঁর খুব পছন্দের ছিল। তারপর আসেন ফরাসী শিল্পী আঁদ্রে কার্প্লে ও সুজাঁ কার্প্লে নামে দুজন ভগ্নী। আঁদ্রে কার্প্লে ভারতীয় শিল্পের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি আশ্রমের মেয়েদের মোম আর রং দিয়ে বাটিকের কাপড় তৈরি শিখিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের তাড়নায়

পালিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন রুশ ভাষাবিদ বগদানভ। "তিনি একাহারী ছিলেন এবং তন্ত্র শাস্ত্র নিয়ে গবেষনা করতেন। চা আর ডিম ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। ঘরে মড়ার খুলি, কংকাল এবং নানা প্রকার তান্ত্রিক প্রতীকের 'চার্ট' টাঙ্গানো থাকত—যাদুঘর বলে ভ্রম হতো ঘরে ঢুকলে।"[১৬] একবার এলেন একজন ডাচ্ চিত্রকর। ইংরাজি ভাষা খুব বেশি জানতেন না, তবু ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তিনি কাঁচের উপর তেল রঙে আঁকতেন। আলুসিদ্ধ আর ডিম ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্য। সব মানুষকেই তিনি বিশেষ কোনও একটা রঙে কল্পনা করতেন। বলতেন, "প্রত্যেকটা মানুষ এক একটি বিশেষ রঙ বহন করেন এবং মানস চক্ষেই তার সেই রঙ দেখতে পাওয়া যায়।"[১৭] তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এঁকেছিলেন সবুজ রঙে। বিশ্বভারতীতে নানা সময় কিছু দিনের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু অধ্যাপক এসে জ্ঞান বিতরণ করে গেছেন। তাঁরা হলেন জাপানী মনীষী ওকাকুরা, শিল্পী রোদেনস্টাইন, জার্মানি পণ্ডিত কাইজারলিং, ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশ, লন্ডনের ভাষাতত্ত্ববিদ স্মিথ, পার্সী অধ্যাপক এইচ পি মরিস, গেডিস, সুইজারল্যন্ড থেকে বেনোয়া, ম্যলেরিয়া বিশারদ কর্নেল বেন্টলি, লেসনি, তুচ্চি, স্তেন কোনো, কার্লো ফরমিকি, কলিন্স, আন্দ্রে কারপেলেজ, হ্যারি তিম্বারস, লেনার্ড এলমহারস্ট, চীনা পন্ডিত তান-য়ুন-শান প্রমুখ। অসিতকুমার হালদার লিখেছেন, "এই ধরনের আশ্রমে আগত তখনকার দেশবিদেশের লোকের কথা লিখতে গেলে মহাভারতে পরিণত হবে।" অপ্রতুল সময়ের জন্য আপাতত কাজে লাগবে না এমন স্মৃতিগুলি রেখে দেওয়া গেল।

----------তথ্যসূত্র----------

১. চিঠিপত্র ৬ সং- ১৬ , ১৯০১, জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা।

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী" দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৭, পৃ ৩৩

৩. অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ৭৪

৪. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ ৫৪

৫. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ ৫৫

৬. সুধীররঞ্জন দাস, 'আমাদের শান্তিনিকেতন', কলকাতা, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৬৬, পৃ ২৮

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ৩৩৭

৮. অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ৭৫

৯. অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ৭৫

১০. শান্তিদেব ঘোষ, 'জীবনের ধ্রুবতারা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২২ শ্রাবণ ১৪০৩, পৃ২৯

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বভারতী', সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২,পৃ৩৫০

১২. অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ৩৪

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কলাবিদ্যা', শান্তিনিকেতন, ১৩২৬ অগ্রহায়ণ

১৪. দিনকর কৌশিক, 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি', পত্রলেখা, কলকাতা, আগস্ট ২০০৯, পৃ ৪৭

১৫. উইলিয়াম পিয়ারসন, 'শান্তিনিকেতন', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ ১৭৬-১৭৭

১৬. অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ৮১

১৭. অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে', কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ৬৭

স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা-আদর্শ ও আনন্দলোক

" জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।"[১]

শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মধ্যে জগতের 'আনন্দ ধারা'-কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই সহজ আয়োজনের মাধ্যমে প্রাণ দিতে পেরেছিলেন। যাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই সেই বৃহৎ আয়োজনের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রায় প্রত্যেকের স্মৃতিকথায় তাই টুকরো টুকরো আনন্দের মুহূর্তগুলো এত সাবলীল হয়ে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন ও বিচিত্র রকমের চিন্তাভাবনার সমন্বয় ঘটেছে শান্তিনিকেতনের নানারকম কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। তিনি যে ভাবে ও আদর্শে শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার একটা ধারণা তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে আছে। যেখানে তিনি বারবার জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ। গুরুগৃহে বাহুল্য বর্জিত জীবন-যাপন করে প্রকৃতির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠাই ছিল আসল মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা। যে শিক্ষার ধারা ব্রিটিশ আমলে এসে খর্ব হয়েছে, খন্ডিত হয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে গেলে তাই ফিরে যেতে হবে শিক্ষার মুক্ত প্রাঙ্গনে। যেখানে খোলা মাঠে আকাশের নীচে, জমিতে বসে, গাছের ছায়ায় হবে শিক্ষা। থাকবে না বদ্ধ ঘর, চার দেওয়াল, টেবিল-বেঞ্চ। শরীর ও মনের পূর্ণ বিকাশের জন্য গড়ে তুলতে হবে এমন এক পরিবেশ যেখানে ধরে বেঁধে 'শিক্ষা' গিলিয়ে দিতে হবে না 'তোতাপাখি'-র মত, যেখানে শিক্ষা বোঝা নয়। "ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আরাম চায় না,...গাছের

ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে।”[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের সম্পর্কে বলতেন- ‘আমার ইস্কুল-পালানো মন’ কিন্তু এমন ‘মন’ তৈরি হবার পিছনে তাঁর যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। তাতে অবশ্য শাপে বর হল, তথাকথিত শিক্ষার বেড়া-জালে তিনি আবদ্ধ হয়ে পরলেন না, একলব্য হয়ে নানারকম জ্ঞান অর্জন করলেন শিক্ষার ভাণ্ডার থেকে। আর সেই জ্ঞান আহরণের পরিধি বাড়িয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় গড়ে তুললেন শান্তিনিকেতন। যার পরিবেশে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষার আয়োজন, যেখানে শিক্ষার্থীরা বেছে নিতে পারবে নিজের পছন্দ মত বিষয়। আসলে ঠাকুর বাড়ির পরিবেশেই এতো রকমের শিক্ষার প্রশ্রয় ছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নির্দিষ্ট কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন করে তা গ্রহণ করতে হয়নি। এই মুক্ত শিক্ষার সূচনা হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় “পিতৃদেব মেজদাদা ছাড়া আর কাউকে বাইরে পড়তে পাঠাননি। তিনি আমাদের বাড়িটাকেই একটা যথার্থ বিদ্যালয় বানিয়ে তুললেন। ...পিতৃদেব সাংসারিক সব ব্যয় যথাসম্ভব সংকুচিত করে জ্ঞানী ও গুনীদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রাখলেন। নিয়ত তাঁদের সমাগমে বাড়ির আবহাওয়া চিন্ময় হয়ে উঠল।...এই আবহাওয়ার কাছেই আমাদের শিক্ষা।”[৩] পিতার এই উদার শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল মাত্র ঠাকুর বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই আটকে রাখতে চাননি, সমগ্র ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ধারণাকে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে এক দুপুরবেলা রামানন্দবাবুকে কাছে পেয়ে তিনি তাই বলেছিলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার ধরণ এমন ছিল যে তা অর্থের বিনিময়ে কিনতে হতো না। জ্ঞান সর্বসাধারণের সাধারণ ধর্মের মতই প্রবাহিত হত,

কারণ বর্তমানের মত তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলনা। শিক্ষার্থীরা ভিক্ষার দ্বারা সব কিছু অর্জন করবে, সমস্ত সমাজের হয়ে সে জ্ঞান সাধনা করবে, সকলের সেবা করবে তবেই তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। তিনি যে আদর্শে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছিলেন তাতে পড়া মুখস্থর কড়া পাহারার বালাই ছিল না, শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মধ্যে সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান্য দেবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। "প্রথম থেকে আমার সংকল্প এই ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারিদিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে—সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে।"[৪] শান্তিনিকেতনের আশ্রম পরিবেশেও তাঁর এমন ধারনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন এখানে প্রথম থেকেই নিজেদের প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম তাঁদের নিজেদেরকে করতে হতো, এমনকি জলখাবারের জোগাড়ও। আয়োজন যৎসামান্য, কিন্ত তাও যত্ন করে শিক্ষকদের পরিবেশন করে তবে খেতে হতো। আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ ছিল, যার মাধ্যমে তারা অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে নিজেদের চরিত্রকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যার উৎপত্তি হলে তার সমাধানও তারা নিজেরাই করত। "সে দিন আশ্রমের কোন আর্থিক সংগতি ছিল না। কিন্তু সেই আশ্রম জীবনের মধ্যে ছিল অনাবিল আনন্দ।"[৫] কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন আশ্রমে "আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো, অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়,"।[৬] মজার কথা হল একেবারে শুরুতে আশ্রমের ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ জন, উপাসনার দিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে জাগাতেন। আশ্রমে কেরানির অভাবে নিজেই এক সময় নিপুন ভাবে সে কাজ করে গেছেন দিনের পর দিন কারও বারণ না শুনে। অর্থৎ এই 'আয়োজনের অভাব' কেবল শিক্ষার্থীদের

উপর তিনি চাপিয়ে দেননি, নিজেও তা পালন করেছেন। তিনি বলেছিলেন মরা মন নিয়েও প্রথম শ্রেনির উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আশ্রমের শিক্ষা হল 'পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা'। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছনে তাঁদের পড়াশোনা নিছক পড়া আর শোনা ছিল না। শৈশবেই মনের মাটিতে শেখার ইচ্ছা বুনে দেওয়া হতো। "যা করবে নিজেরা করো",- এই যে শিক্ষা , এর মূল্য নিরূপণ-অসাধ্য।...ছোটবেলা হতেই স্বাধীন হও চিন্তা ও কর্মে । কিন্তু নিয়ম ভেঙোনা। নিয়মানুবর্তী থেকেই স্বাধীন মানুষ হতে শেখো"।[৭] এই তো ছিল ওখানকার রীতি।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে গেলই তিনি তাঁর স্কুল জীবনের কঠোর দিনগুলির কথা মনে করতেন, আর সে ভুল সংশোধনের জন্যই তিনি বারবার আশ্রম গড়ে তোলার কথা লিখেছিলেন। আশ্রমের সৃজনশীল শিক্ষাদানই 'খুশির দান'। সমগ্র জীবনের সজীব শিক্ষার জন্যে যা একমাত্র উপায় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তবায়ন কতদূর সম্ভব হয়েছিল তা বোঝা যায় শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের স্মৃতিকথা পড়লে। তাঁরা শান্তিনিকেতনকে শিক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে নয়, দেখেছেন নিজেরই আর একটা বাড়ী হিসেবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্বিশেষে সকলে থেকেছেন একই পরিবারের মতো করে, একই আত্মার আত্মীয় হয়ে। আশ্রম জীবনের নানা কাজের সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দ কেমন অনায়াস ভাবে মিলেমিশে ছিল তা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মুজতবা আলী, মহাশ্বেতা দেবী, দিনকর কৌশিক, রানী চন্দ প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিক মানুষের স্মৃতিকথা পড়লে বোঝা যায় । তাছাড়া স্মৃতিকথা হল এমনই একটি মাধ্যম যার মধ্যে অদৃশ্য একটি ছাঁকনি আছে যা কেবল বেছে বেছে ভালো ও আনন্দের মুহূর্তগুলোকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে, মন্দভাবের কাঁটাগুলো সন্তর্পণে ফেলে আসে বিস্মৃতির অতলে। ফলে আমাদের সামনে শান্তিনিকেতনের যে চিত্র স্পষ্ট হয় তা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর। ঠিক যেমনটা

রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন-"প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দ্যেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব, কিন্তু আমার মনে হোল যে, মানুষে-মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে, তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট-লোকে মুক্তি দিতে হবে। মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাঙ্ক্ষিত উদ্দ্যেশ্য যে সফল হয়েছে আশ্রমিকদের সুমধুর স্মৃতিকথাগুলিই তার প্রমাণ বহন করছে। এই আলোচনায় সেই রকমই মজার স্মৃতির বেশ কিছু কোলাজ আছে। যে স্মৃতিগুলির মধ্যমে ফিরে পাওয়া যাবে শান্তিনিকেতনের একেবারে শুরুর দিকের আসল নির্যাস টুকু। প্রায় সকলেই জানেন ভুবনডাঙার মাঠে ছিল ডাকাতের উৎপাত, হিমালয়ের নানা স্থান ভ্রমন করে ফিরে আসবার পথে লাল মাটির এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সন্ধ্যেবেলা জনমানব শূন্য এই অঞ্চলে তিনি সাধনায় বসলেন, শোনা যায় ডাকাতদলের সর্দার লুঠের মন নিয়ে মহর্ষির কাছে এসেছিল, কিন্তু তাঁর ধ্যান মূর্তি কাছে অস্ত্র ত্যাগ করে নতি স্বীকার করেছিল। হয়তো শান্তিনিকেতনের উদারতার সূত্রপাত এভাবেই হয়েছিল। পিয়ারসন সাহেব তাঁর স্মৃতিতে জানিয়েছেন প্রথম যে দিন 'গোধূলি'বেলায় শান্তিনিকেতনে এলেন, সেদিন রাতের আশ্রমের নিরিবিলি প্রকৃতির স্পর্শ, ছাত্রদের গাওয়া বৈতালিকের গান কেমন ভাবে তাঁর মনে স্থায়িভাবে স্থান পেয়েছিল। অসিতকুমার হালদার তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন মা-বাবা এবং তাঁর শিক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে যখন প্রথমবার শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হয়ে এলেন, গরুর গাড়িতে চড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং গেছিলেন তাঁকে নিয়ে আসতে। কাঁচা রাস্তার দুপাশের 'রক্তধুলি আকীর্ণ'

কাশবন, তাল ও শাল গাছের সারি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল-"জলচর পাখিরা এবং তাল ও শালতরুশ্রেনী যেন সকলকেই উদারভাবে আহ্বান করচে।...আশ্রমে প্রবেশ করার মুখেই শিশুদের সমবেত কণ্ঠে বেদগান মুখরিত হল—আর তার পরেই দেখলাম প্রার্থনারত ছেলেরা মাঠে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে আসনে বসে আছে—যেন বালখিল্য বুদ্ধের সার দেখচি—যেন চোখ জুড়িয়ে গেল।"[৯] আশ্রম শান্তিনিকেতনের এই যে রূপ তা শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার পরও কতটা অমলিন ছিল তা বোঝা যায় স্মৃতিকথা পড়লে। ক্ষিতিমোহন সেন স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন 'শিশুদের সঙ্গে কবির অপূর্ব সখ্য' প্রায় দিন সন্ধেবেলা সব কাজ অবলীলায় ফেলে তিনি কেমন ব্যকুল হতেন শিশুদের সঙ্গে গল্প করার জন্য। শিশুরাও আনন্দে ভরপুর এই সন্ধ্যার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। এর সঙ্গে চলত তাঁদের জন্য গান, হেঁয়ালি-নাট্য, আবৃত্তি পাঠ ও অভিনয়ের ব্যবস্থা। এ সব বানানোর কাজে শিশুরাও মহা উৎসাহে যোগ দিত, প্রধান সহায়ক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এভাবেই তৈরি হয়েছে ছেলেদের জন্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'মুকুট'। মেয়েদের জন্য 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। এই অভিনয়ে তিনি নিজেও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন, আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সব রকমে আনন্দদান করা ছিল তার চরিত্রের বিশিষ্টতা।এই ছোট ছোট প্রাণ গুলিকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, সত্যের সঙ্গে প্রচুর জল মিশিয়ে তা পরিবেশন করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। আসলে তাঁর শিক্ষা দেবার পদ্ধতিই ছিল ভিন্ন- "যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।"[১০]

প্রথম শান্তিনিকেতন আসার পথে ঘটা নানান ভুল ও মজাদার গল্প জানা যায় শিশিরকুমার ঘোষ, সুধীররঞ্জন দাস, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখের স্মৃতিকথা থেকে। বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোটবেলায় প্রথম শান্তিনিকেতনে আসার সময় মহাশ্বেতা দেবীর বাবা ভুলবশত নেমে পড়েছিলেন 'ভেদিয়া' নামক স্টেশনে,'নেমেই বাবা চেঁচিয়েছিলেন, "বোলপুরে নামলাম স্টেশনের নাম ভেদিয়া কেন?"[১১] তারপর স্টেশন-মাস্টারের সহায়তায় সেই শীতের রাতে গরুর গাড়িতে চড়ে পৌঁছলেন শান্তিনিকেতন। লীলা মজুমদার লিখেছিলেন খানা জংশন থেকে লুপ লাইনে গাড়ি চলতে শুরু করলে শুকনো মাটির লাল রঙ পৃথিবীর চেহারাই যেন বদলে দিল, 'সেই প্রথম দেখার বিস্ময় আজো ভুলিনি'। সুধীররঞ্জন দাস মহাশয়কে তাঁর সোনা দাদা শান্তিনিকেতনে আসার আগে বাড়ি থেকে ভয় দেখিয়েছিল এই বলে-"যাও-না, দেখবে কেমন মজা ; কলকাতার কটন ইস্কুলের নাম শুনেছ তো? সেখানে মেরে ছেলেদের তুলোধোনা করে দেয়। সেখানেও তোমার সানাবে না বলে তোমাকে রবি ঠাকুরের ইস্কুলে পাঠানো হচ্ছে। রবি ঠাকুর ঠেঙিয়ে তোমাকে সোজা বানিয়ে দেবেন।"[১২] তাই আসার দিন ট্রেনে ওঠার পর থেকেই তাঁর মনটা যেন কেমন অবশ হয়েছিল। তারপর স্টেশনে নেমে 'দ্বিপুবাবুমশায়ের' পাঠানো 'বয়েল' গাড়িতে চড়তে পেরে তাঁর মনের ভয় কেটে গিয়েছিল।

কেউ কেউ আবার শান্তিনিকেতন আসার আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে শুনেছিলেন নানা রকম ঘটনা। পরে অবশ্য সে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁদের স্মৃতিকথায় লেখা শান্তিনিকেতনের সেই মজার ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় কিভাবে বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন ভাষার মানুষজন শান্তিনিকেতনের আঙিনায় এসে একেবারে মিলেমিশে গিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের উদার-মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তাঁরা জানলেন চিনলেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কখনও শিক্ষক হিসেবে, কখনও পথ প্রদর্শক হিসেবে। একাধারে সংগীতকার-সুরকার-গায়ক, নাট্যকার, অভিনেতা ইত্যাদি আরও কত ভূমিকায়। সর্বোপরি প্রতিদিনকে নতুন করে চিনতে শেখা, নতুন করে বাঁচতে শেখা একজন জীবন-রসিক মানুষকে। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানতে গেলে জানতে হয় শান্তিনিকেতনকে, শান্তিনিকেতনের আদর্শ কে। তাই তো রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁদের জানার আগ্রহ সবসময় বর্তমান থাকে। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা বিশিষ্ট মানুষ জনের স্মৃতিকথা থেকে শান্তিনিকেতনকে জানার পথই সবথেকে সহজ মাধ্যম। বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষের স্মৃতিকথায় বারবার যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি-পরিবেশ, ঋতু পরিবর্তনে আয়োজিত নানান উৎসব, হাতে-কলমে শিক্ষার অভিনব পদ্ধতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অদ্ভুত প্রাণের সম্পর্ক ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত শান্তিনিকেতনে আসার আগে শুনেছিলেন রবি ঠাকুরকে তাঁর একটি চাকর প্রতিদিন কমলালেবুর খোসা ও মটর ডাল বেটে মাখান, আর একটা চাকর আতর মাখানো চিরুনি দিয়ে চুল-দাড়ি আঁচড়ে দেয়। কাশীতে থাকাকালীন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় রবি ঠাকুরের চিঠি পান। কিন্তু তাঁর পরিচিত কলকাতার কিছু লোক তাঁকে এই বলে শান্তিনিকেতনে আসতে নিষেধ করেছিল যে, রবি ঠাকুরের "অশন, বসন, জীবনযাপনপ্রণালী এতদূর ধনাঢ্যজনোচিত যে সেখানে টিকিতেই পারিবে না।", " তিনি ধনি, অভিজাত, তাঁর কাছে বাস করিবার যোগ্যতা কি তোমাদের আছে?"।[১৩] সব ভয় পিছনে ফেলে যে দিন তিনি বোলপুরে স্টেশনে এসে নামলাম, নেমেই শুনতে পেলেন গান। কুলি বললেন, "এই গান করিতেছেন 'কাঁচা বাংলার বাবু' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ।"[১৪] আর শান্তিনিকেতনে এসে রবি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা

করে তিনি বুঝলেন তাঁর জীবন অতি সরল-সাদা। তাঁর ভৃত্য সংখ্যা মাত্র এক, নাম উমাচরণ। সে মারা গেলে এসেছিল সাধু, যার গাম্ভীর্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করে বলতেন- " তা'কে কি আপনি ভৃত্য বলেন? সে যে আমার গার্জেন। বাবা সে কী গম্ভীর ![১৫]"। রবি ঠাকুরের খাবার ইত্যাদির কোন বাহুল্য ছিলনা, পোশাক-পরিচ্ছদও খুব বেশি ছিলনা। কিন্তু কয়েকটি জোব্বাই ধুয়ে-কেচে এমন সুন্দর করে পরতেন দেখে মনে হতো যে তাঁর অনেক আছে। এ বিষয়ে রামানন্দ বাবুই ঠিক আন্দাজ করেছেন-"দূর হইতে আপনাকে দেখিলে মনে হয় আপনার বুঝি খুব আড়ম্বরময় জীবন। কিন্তু কাছে আসিয়া দেখি আপনার জীবনও খুব সাদাসিধা ! আপনার ঘরে একখানি হাতপাখা অবধি নাই, ...চেয়ার নাই, টেবিল নাই, মাদুরে বসিয়া সামান্য ডেস্কে রাখিয়া লেখেন।...আসলে আপনার চেহারাটাই রাজসিক। একখানি ফর্সা কাপড় পরিলেই আপনাকে রাজার মতো দেখায়।"[১৬]

এতো গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে মজার স্মৃতি। শান্তিনিকেতনর আশ্রম পরিবেশে শিক্ষার্থীরা এমন কয়েকজন শিক্ষককে পেয়েছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের ঘরের মানুষ। যাঁদের কাছে কোনও ভয়, সংকোচ তাদের ছিলনা। যেমন ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সকলের প্রিয় 'দিন্-দা'। তাঁর 'বেণুকুঞ্জ'-এ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেমন মজলিশ জমাতেন, ঠিক তেমনি ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও তাঁর ছিল অনায়াস হৃদয়-যোগ। তেজেশচন্দ্র সেন মহাশয় জানিয়েছেন শিশু বিভাগের ক্লাস নেবার সময় কেউ তাঁর গলা জড়িয়ে বসত, কেউবা বসত কোল ঘেঁসে, চলত নানারকম মজার গল্প। তিনি উঠবার চেষ্টা করলেই সকলে মিনতি করত 'দিন্-দা আর একটু বসুন'। শিশুদের সঙ্গে তাঁকে দেখলে মনে হত 'শিশু বিভাগেরই একটি বৃহৎ শিশুর মতো'। ঠিক যেমনটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন "ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব

বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাকার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না।”[১৭] এমন সহজ মানুষটির আবার কি অসাধারণ গুণ,রবি ঠাকুরের গান একবার শুনলেই তা সহজে হুবহু মনে রাখতে পারতেন। তাইতো তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “গানের ভাণ্ডারী”। তাঁর বাড়িতে হইচই গানবাজনা লেগেই থাকত, গান গাইবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালে কাউকে তিনি ফেরাতেন না। এক বিয়েবাড়ির মজার ঘটনা জানিয়েছেন লীলা মজুমদার–“একটা কৌচে বসে আশ্চর্য ভালো গাইলেন। উনি উঠে গেলে পর দেখা গেল কৌচের তলা ফুঁড়ে স্প্রিংগুলো ঝুলছে”। তবে সেকথা তাঁকে বলাতে তিনি কিছুতেই তা বিশ্বাস করলেন না। বলেলন-“ মোটা হতে পারি, তবে সে রকম কিছু নই।”[১৮] সেদিনের শান্তিনিকেতনে এমন ছাত্র বিরল যিনি ‘দিন্-দা’-র বাড়িতে যখন-তখন গিয়ে ভোজ আদায় না করেই ফিরে এসেছেন। কেবল খেতে নয়, খাওয়াতেও তিনি বড্ড পছন্দ করতেন।

“তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত।”[১৯] আশ্রমের পরিবেশে এমন কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন যাঁদের তপস্যার প্রবাহমান ধারা শিক্ষার্থীদের মনকেও গতিশীল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন ছিলেন নন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতনে এক ডাকে সকলে চিনত ‘মাষ্টার মশাই’ বলে। শ্যামাকান্ত সরদেশাই জানিয়েছেন দক্ষিণ-আফ্রিকায় সহায়তা পাঠাবার অনুরোধ যখন এলো। সে চিঠি পড়ে নন্দলাল বসু শিক্ষার্থীদের উপর সাহায্যের বিষয়টা চাপিয়ে দিলেন না বরং তাঁদের মত জানতে চাইলেন। তারপর শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে বাগান করে, মাল বহন করে, বাড়ি তৈরির কাজে শ্রম দিয়ে, খাবারের থেকে টাকা সঞ্চয় করে সে

টাকা ত্রাণ তহবিলে পাঠিয়েছিল। এমন দেশভক্তির কাজেও ছিল আনন্দ, যে বাড়ির গৃহসজ্জার কাজ সবচেয়ে সুন্দর হতো তাঁদের দল পেতো পুরস্কার। শিশিরকুমার ঘোষ লিখেছেন-"শুধু ছবি আঁকার শিক্ষক নন, জীবনের সবচেয়ে বড় নানারকম শিক্ষা পেয়েছি তার কাছ থেকে।...আমার ধারণা নিয়মিত ক্লাসের বাইরের যে শিক্ষা সেটা অনেক বেশি স্থায়ী।"[২০] নন্দলাল বসুর বিশ্বাস ছিল 'ছবি তৈরি হয় মনের মধ্যে,হাত দিয়ে কাগজের উপর নয়, সে তো শুধু সেই মনের ছবিটার বাইরের প্রকাশ।'[২১] মনের ক্যানভাসেই আসল, তা তৈরি করার শিক্ষাই তিনি দিতেন গল্পের আদলে। দিনকর কৌশিক জানিয়েছেন 'বিনয় ছিল তাঁর স্বভাব মাধুর্য !' শিক্ষার্থীদের কোনও কারণে শাসন করলে, কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলতেন মেজাজের জন্য 'স্বভাব দায়ি, মানুষ নয়'। আসলে আঘাত না করে শুধরে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দ্যেশ্য। শান্তিনিকেতনে এই শাস্তিরও নানা মজাদার গল্প আছে। নগেন আইচের ক্লাসে একবার অঙ্ক না পেরে বসে বসে খাতায় কবিতা লিখেছিলেন প্রমথনাথ বিশী। অঙ্কের খাতায় এমন কাণ্ড দেখে শিক্ষকের রুদ্র মূর্তি, বললেন-'দেখুন ছোকরার কাণ্ড, অঙ্কগুলি সব ভুল করিয়াছে,সে কথা ধরি না, ...তার পরে কিনা অঙ্কের খাতায় কবিতা'। অর্থাৎ অন্য বিষয়ের খাতায় এমন হলে সে অপরাধ যেন মার্জনা করা চলতো। রবি ঠাকুর দরবারে বিচার হল, তিনি বললেন– এর মত কয়জন ভক্ত কবি পাবে "প্রশ্নপত্রের দশটা অঙ্কের উদ্যত দশখানা খড়্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এভাবে আত্ম-নিবেদন করিতে পারে।"[২২] বিধান দিলেন অঙ্ক আর কবিতা দুই চালিয়ে যেতে। আশ্রমের বাগানে একবার ভুট্টা চুরি কতে গিয়ে নিশিকান্ত রায়চৌধুরী 'বৌঠান' অর্থাৎ প্রতিমা দেবির কাছে ধরা পড়লেন। তিনি বললেন-'দেখি কটা তুলেছ ? দাও ওগুলি' চুরি সম্পর্কে কোনও কথাই হল না। একটু পরে ভুট্টাভাজা ও মিষ্টি পরিবেশিত হল। বললেন- 'আর যাতে চুরি না কর তাই

খাওয়ালাম।'[২৩] এই হল শাস্তির নমুনা। আবার শিক্ষকদের মধ্যে কেউ বেত রাখলে রবীন্দ্রনাথ তা চুপচাপ সরিয়ে দিতেন, পরে চায়ের নিমন্ত্রন করে তা হাসি মুখে তাঁকে ফিরিয়ে দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বাস ছিল প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকা আবশ্যক কারণ তা উভয়ের পক্ষেই আনন্দের। শান্তিনিকেতনের অঙ্গনে তাঁর সে বিশ্বাস সরূপ ধারন করতে পেরেছিল, বহু শিক্ষার্থীর স্মৃতিকথায় সে প্রমাণ আচ্ছে। "এখানে এই ছাত্র-শিক্ষকের সহজ সম্পর্ক দেখে অবাক হয়েছিলাম।...আমরা তো মাস্টারকে ভয় করে চলতে হয় তাই জানি। এখন বুঝি শিক্ষক-ছাত্রের এই চমৎকার সম্পর্কই তো এখানকার সম্পদ। সম্পর্কই যদি ভালোভাবে গড়ে না উঠল তাহলে প্রকৃত শিক্ষা কেমন করে হবে ?"[২৪]। আশ্রমের পরিবেশে আপন-পরের বালাই ছিলনা। সকলেই সকলের ঘরের মানুষ, তাই নতুন কেউ এলে সহজেই সে মানিয়ে নিতে পারত। 'অল্প দিনেই বুঝে নিলাম যে, সেখানে বাড়ির জন্য মন-কেমন-করার খুব অবকাশ নেই,' সেখানে 'সকলের আত্মীয়তার সম্বন্ধ'।[২৫] রানী চন্দের লিখেছেন, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত সাধারণ সুখ-দুঃখ, সাধারণ ঘরকন্না নিয়েই আশ্রমে ছিলেন তাঁরা। অসাধারণ ছিল কেবল তাঁদের প্রাণের অফুরন্ত উল্লাস, আর মনের সুগভীর আনন্দ। অতি আগ্রহীরা প্রশ্ন করবেন সব সুন্দর ছিল ? কোনও বিবাদ-মনোকষ্ট কি ছিলনা ? হ্যাঁ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারত না, ঝোড়ো হাওয়ার মতো হঠাৎ এসে আবার নিজেই মিলিয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন শিশু মনে যতটুকু শিক্ষা প্রভাব ফেলে সেটুকুই আসল শিক্ষা, শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতা কিম্বা অক্ষরের সংখ্যা মাত্র নয়। তাই শিশুকে এমন ভাবে

শিক্ষা দিতে হবে যার দ্বারা তার স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, প্রকৃতির ক্ষমতাগুলিকে সে চালনা করার জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সকলের প্রিয় 'তেজু-দা' অর্থাৎ তেজেশচন্দ্র সেনের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল অনেকটা এই রকম। তিনি ছোট থেকেই শিক্ষার্থীদের শেখাতেন নানান উপকারি গাছ ও তাঁদের ব্যবহার সম্বন্ধে। বলতেন-' প্রকৃতি যা সৃষ্টি করে তারই নানা উপকার'। এই ছোট্ট কথাটা মহাশ্বেতা দেবীর মতো শিক্ষার্থীরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই না প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিল। হাতে-কলমে গুটিপোকা লালন-পালন করাটা তাই তাঁদের কাছে অনেকবেশি আনন্দের হয়ে উঠতে পেরেছিল। তাঁরা জানতে শিখেছিল, 'শাল গাছের গুটিপোকা থেকে যে প্রজাপতি বেরোত, সে যেন নুরজাহান ! ধপধপে সাদা দানায় সোনালি পাড়। আকারে অনেক বড়ো।''মাধবীলতার গুটিরা...প্রজাপতি হয় না মথ হয়।'[২৬] তিনি শিখিয়েছিলেন প্রকৃতি ও প্রাণীদের সম্মান করতে। গাছেদের, পাখিদের এমনকি কেঁচোকেও বলতেন 'আপনি', এ ভারি মজার কথা ছিল শিক্ষার্থীদের কাছে। "কেঁচো মাটি খাচ্ছেন, বের করছেন", "পাখিরা কী করছেন" ইত্যাদি। কেবল মহাশ্বেতা দেবী নন তেজেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রকৃতি পাঠ সম্পর্কে লীলা মজুমদার, সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ স্মৃতিকথায় বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতির কথা মনে রেখেই হয়তো সে সময় আশ্রমে জীব হিংসা বন্ধ ছিল, অথবা শিক্ষার্থীদের মনোভাবই প্রাণী হত্যা থেকে তাঁদের বিরত হতে সাহায্য করেছিল। একবার একজন বৌদ্ধ সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেছিলেন, "আমি ভালোবাসি গাছপালা, তরুলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ফুলে ফুলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া।"[২৭] প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ-মালীর এই যোগ বিশেষ আনন্দের। প্রকৃতি আর মানুষের ভালোবাসা থেকে

গাছদের মত শিশুরাও প্রানশক্তি সঞ্চয় করে। কারণ মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনিই জাগে খুশি, ছড়িয়ে পরে প্রাণের আনন্দ। সেই খুশিই শান্তিনিকেতনের সব কাজে মিশে ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন না। কিন্তু তার ঘরের দরজা শিক্ষক, ছাত্র, সাধারণ মানুষ সকলের জন্য থাকত খোলা। যার সাহসে কুলোত সেই তাঁর কাছে সরাসরি গিয়ে মনের ইচ্ছে জানাতে পারত। কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নয় ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, তেজেশচন্দ্র সেন, দিনু ঠাকুর এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আশ্রমের শিক্ষার্থীদের ছিল অবাধ যোগাযোগ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝের দেওয়াল বলে এখানে কিছু ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটদের ক্লাস নিলে শিক্ষকগণও মাঝে মাঝে সেখানে বসে পড়তেন। এ বিষয়ে তিনি মৃদু-মধুর আপত্তি তুলে বলতেন "মহাশয় আমি ছোটো ছেলেদের পড়াই ।... আপনার ক্ষেত্রে তো আমি দেখিতে যাই না। আপনি কেন এই ছোটোদের আসরে আসেন ?"[২৮] আসলে তাঁর পড়াবার পদ্ধতির মধ্যে এমন চমৎকার নতুনত্ব থাকত যা কেবল শিশুদেরই নয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণকেও আকর্ষণ করতো।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষার আরও একটা মজার দিক হল, তখনকার সময়ে একজন ছাত্র বিষয়-জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে একই সঙ্গে উচ্চ ও নিম্ন স্তরে শিক্ষা নিতে পারতো । অর্থাৎ ব্যপারটা হত এমন কেউ যদি বাংলা-ইংরাজি তে ষষ্ঠ শ্রেনিতে পড়ে অঙ্কে সে সপ্তম শ্রেনি ভুক্ত হতে পারতো। তবে বছরের শেষে সে যাতে ষষ্ঠ শ্রেনিতে সকল বিষয়ে উপযুক্ত হতে পারে তাঁর ব্যবস্থা করা হতো। এটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত প্রমথনাথ বিশী নিজেই এইরূপ বিচিত্র শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। গণিতে তিনি বরাবর এক শ্রেনি নীচে পড়তেন। আবার এক বিভাগে ভর্তি হতে এসে

তা না হতে পেরে অন্য বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন এমন ছাত্রও সেদিনের শান্তিনিকেতন বিরল নয়, তিনি দিনকর কৌশিক। এসেছিলেন নন্দলাল বসুর কাছে আঁকা শিখতে কিন্তু পাকেচক্রে নাম লেখাতে হল ওয়াঝেলওয়ার 'ক্লাসিকাল সংগীতের' ক্লাসে। তাতে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই, কদিন বাদেই কলাভবনের আশেপাশে ঘুরতে দেখে নন্দলাল বসুর ডাক এলো" কিছু কাজ আছে তোমার ? দেখি !" আসল কথা, এ হল রবি ঠাকুরের কল্পনার জগৎ যা সত্যিই বাস্তবের রূপ লাভ করেছিল।

এবার জানবো মনভালো করা কিছু এলোমেলো মজার স্মৃতি। সৈয়দ মুজতবা আলী জানিয়েছেন, মারাঠি ছাত্র 'ভান্ডারে'-র 'দান-খয়রাত'-এর কাহিনি। প্রথম দিন আশ্রমে এসে সে দেখল শালবীথি দিয়ে 'লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি' পরা একজন হেঁটে আসছেন, তো সে কাউকে না বলে একছুটে তাঁর কাছে গিয়ে কিছু একটা তাঁকে জোর করে হাতে দিলো। হাসতে হাসতে মৃদু আপত্তি জানিয়ে তিনি সেটি নিয়ে জোব্বার পকেটে রাখলেন। সেও হাসি মুখে ফিরে এল। সবাই অবাক, জিজ্ঞাসা করল- "গুরুদেবকে কি দিলি ?" সে বলল, "গুরুদেব কৌন ? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।...ক্যা 'গুরুদেব''গুরুদেব' করতা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নী দিয়া।"[২৯]সকলে ভাবল এ নিশ্চিত পাগল। আসলে শান্তিনিকেতন আসার সময় ভান্ডারের ঠাকুরমা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'সন্ন্যাসী দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে'। ডক্টর ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে আসার পর উইপোকা দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ একজন ইউরোপীয় মানুষের কাছে তা একেবারে নতুন একটা জিনিস। অসিতকুমার হালদার লিখছেন- "তাঁর সাধ মিটতে দেরি হয়নি,--তার জুতোর তলা উইপোকায় চেটে মেরে দিয়েছিল। তিনি উইয়ের ঢিবি আশ্রমে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন—উইপোকার রাজত্ব ছিল তখনকার

আশ্রমে।"[৩০] একদিন একটি ছোট্ট মেয়ে ও তার মা এসেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ছোট্ট মেয়েটি কিছুতেই বাড়ি যেতে চায় না। "তার মা বললেন- 'এই তো রবি ঠাকুর দেখা হল আবার বসে আছিস কেন ?' মেয়ে বলল, 'চলতে দেখিনি।" রবীন্দ্রনাথ তক্ষুনি উঠে পায়চারি করে বললেন, "এই তো চলতেও দেখলে, এবার তাহলে বাড়ি যাও।"[৩১]মজার বিষয় হল তাঁর সম্পর্কে ছোটদের এমন কৌতূহলও তিনি নির্দ্বিধায় মেটাতেন। লীলা মজুমদার শান্তিনিকেতনের কত ঘটনারই সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবারই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন নিয়ে বিশেষ উচ্চ ধারনা ছিলনা। তাঁর মতে শান্তিনিকেতন ' যত সব লম্বা-চুলো, চিবিয়ে কথা বলা ন্যাকার দলের আবাস।' লীলা মজুমদারের অবশ্য এমন ভ্রম ভুল করেও ছিল না। বরং আশ্রমে এসে সাহেব-মেমদের খদ্দরের ধুতি শাড়ি পরতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল এই লালমাটির এমন এক টান আছে যেখানে অন্য দেশের মানুষও একাত্ম হয়ে যেতে পারে।

বিদ্যা-শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনই জীবন বিচ্ছিন্ন জড় মাধ্যম হিসেবে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিক্ষা পদ্ধতির যে ত্রুটি ছেলেবেলায় তাঁকে বারবার বিব্রত করেছে,শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার মাধ্যমে সে অভাব তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন। "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না।"[৩২] তাঁর কাছে 'শিক্ষা' হল একটা 'বোধ', যে বোধের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে বিশ্বপ্রকৃতি ও আত্মার যোগ, আনন্দ ও মুক্তি চেতনা। আর তাই গড়ে তুলেছিলেন প্রাচীন 'ওষধি-বনস্পতির মধ্যে' আশ্রম বিদ্যালয়। যেখানে "...প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে ধ্বনিতে ও

রূপবৈচিত্র্যেত নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে'। পূর্ববর্তী কালে "এমন প্রকৃতির মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্তে নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন : যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে।"[৩৩] সেই প্রাণের আনন্দযোগ তিনি আরও একবার ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন শান্তিনিকেতনের পরিবেশে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন আনন্দের সঙ্গে পড়াশোনা করলে পড়ার শক্তি অলক্ষেতেই বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা ব্যবস্থার সব অচলায়তন ভেঙে শিশু বয়স থেকেই সমস্ত শিক্ষার্থীদের খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে আত্মনির্ভর হবার শিক্ষা শুরু করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর সেই বৈচিত্রময় শিক্ষার অভিনব আয়োজন শিক্ষার্থীদের আগামী জীবনকে বলিষ্ঠ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তী কালে বিশ্বের নানা স্থানে ছড়িয়ে গিয়ে তাঁরা এই শিক্ষাকে বিস্তৃত করেছিল। আত্মিক দিক দিয়েও তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন স্বাবলম্বী। সেই স্মৃতিই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিকথায়। এত আনন্দের কথা জানার পর হয়তো মাথায় আসবে শান্তিনিকেতনের সব ঘটনাই কি সুন্দর, তাতে কি কোনও ভুল-ত্রুটি ছিলনা। নিশ্চয়ই ছিল, তবে স্মৃতির পর স্মৃতি জমতে জমতে কাঁটাগুলো খসে পড়েছে, কেবল মনে রয়েছে ফুলের রং-রূপ আর মধুর অনুভূতি। শান্তিনিকেতনের উত্তর দিকের প্রধান তরণের শীর্ষদেশে লোহার ফলকে লেখা আছে 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি'। রবি ঠাকুরের স্বপ্ন রাজ্যের যারা ভাগীদার হতে পেরেছিলেন তাঁদের জীবন ও স্মৃতিকথায় সেই আনন্দের রূপই বারেবারে ফিরে ফিরে ধরা দিয়েছে।

---------- তথ্যসূত্র ----------

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘গীতবিতান’ (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রন কার্তিক ১৪৩২, বিভাগ আনন্দ, গান সংখ্যা ৩১৭, পৃ ১৩৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন ভাদ্র ১৪১৭, আশ্রমের শিক্ষা, পৃ ২৪৬

৩. ক্ষিতিমোহন সেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রন মে ২০১০, পৃ ১৬৭

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২ পৃ ৩২০

৫. নন্দিনী দেবী, ‘পিতা-পুত্রী’, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ ৩৬

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ২৪৮

৭. মহাশ্বেতা দেবী, ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১,,পৃ ৯০

৮. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ ১৫

৯. অসিতকুমার হালদার, ‘রবিতীর্থে’, কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ ৩২

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন ভাদ্র ১৪১৭, আশ্রমের শিক্ষা, পৃ ২৪৫

১১. মহাশ্বেতা দেবী, ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১, পৃ ১১

১২. সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর, ‘শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ’, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি,পৃ ১৫

১৩. ক্ষিতিমোহন সেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রন মে ২০১০, পৃ ৩৪-৩৫

১৪. ঐ, পৃ ৩৪

১৫. ঐ, পৃ ৩৫

১৬. ঐ, পৃ ৪৬-৪৭

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন ভাদ্র ১৪১৭, আশ্রমের শিক্ষা, পৃ ২৪৬

১৮. লীলা মজুমদার, ‘পাকদণ্ডী’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ২২৯-২৩১

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন ভাদ্র ১৪১৭, আশ্রমের শিক্ষা, পৃ ২৪৫

২০. শিশিরকুমার ঘোষ, ‘আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন’, প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশ ১৯৬২, পৃ ২৫-২৬

২১. লীলা মজুমদার, ‘পাকদণ্ডী’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ২২৯-২৩১

২২. প্রমথনাথ বিশী, ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন ফাল্গুন ১৩৯৩ পৃ ১২-১৪

২৩. শিশিরকুমার ঘোষ, ‘আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন’, প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশ ১৯৬২, পৃ ১৩

২৪. ঐ, পৃ ৬

২৫. টুকটুক রায়, ‘আশ্রমিক বীরেন্দ্রমোহন’, সুবর্ণরেখা, শান্তিনিকেতন, প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, ‘যেমন গুরু তেমনি চেলা’ লীলা মজুমদার, পৃ ৪৭

২৬. মহাশ্বেতা দেবী, ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’, সৃষ্টি প্রকাশনী,কলকাতা, ২০০১, পৃ ৩৫

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন ভাদ্র ১৪১৭, আশ্রমের শিক্ষা, পৃ ২৪৫

২৮. ক্ষিতিমোহন সেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রন মে ২০১০, পৃ ৮০

২৯. সৈয়দ মুজতবা আলী, ‘গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রন ২০১৭, পৃ ২৬-২৭

৩০. অসিতকুমার হালদার, ‘রবিতীর্থে’, কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫, পৃ 80

৩১. লীলা মজুমদার, ‘পাকদণ্ডী’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ২৪৪

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ৩১৫

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শিক্ষা’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ৭৯

শেষের কথা

একথা অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাকি সৃষ্টির থেকে বিশ্বভারতী কোনও অংশে কম নয়। তুল্যমূল্য বিচারে হয়তো একটু বেশিই। তাই একটু সাহস করে বলাই যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব সৃষ্টির মূলে যে মানব প্রেমের প্রাধান্য, সেই আদর্শেরই সম্পূর্ণ প্রতিফলন তিনি ঘটাতে চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে। একদিক থেকে দেখলে তাঁর গান, কবিতা, সাহিত্য মানুষকে ভাবায় বলেই তাঁকে, তাঁর জীবনকে আরও একটু বেশি করে জানার জন্য মানুষ ছুটে যান বিশ্বভারতীর দরবারে। আবার যাঁরা শিক্ষা আদর্শ নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা সেখানকার শিক্ষার উদার বৈভব দেখে আকৃষ্ট হন 'বিশ্বভারতী'র উৎস ভাবনার সন্ধানে। অর্থাৎ আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মানুষ মনে রাখছে বা চর্চা করছে তার একটা অন্যতম কারণ বিশ্বভারতীর অবস্থান। মানে বিশ্বভারতী না থাকলে তাঁকে নিয়ে চর্চা হত ঠিকই কিন্তু হয়তো এত বৃহৎ ভাবে হত না। বর্তমানে বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শের অবক্ষয়ে বারবার এ কথাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমস্ত বিষয়ে আঘাত পেয়ে লোকালয় থেকে অনেক দূরে এমন একটি নির্জন স্থানে আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা করলেন এত ত্যাগ, এত কষ্ট সহ্য করে তার মূল্য কি কেউ বুঝলো না? তাঁর ঐ আত্মত্যাগের স্মৃতি মানুষ কি এত সহজে ভুলে গেল? হয়তো তা নয়, শান্তিনিকেতনকে এখনও যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা প্রতিষ্ঠানটিকে এখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছেন একেবারে শেষ হয়ে যেতে দেননি।

পূর্ববর্তী আলোচনায় বিশ্বভারতীর কেবলমাত্র ভালো আর উন্নতির দিক গুলি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তবে কি স্মৃতিকথায় কেউ বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কোনও খারাপ অভিজ্ঞতার কথা

লেখেননি? হ্যা অবশ্যই লিখেছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন সব বৃহত্তর কাজের পিছনে ক্ষুদ্রতর স্মৃতিগুলি চাপা পরে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য যাঁরা পেয়েছেন, তাঁর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় তাঁদের ভালো স্মৃতির পাল্লা একটু বেশিই ভারী হয়ে গেছে। তবু ত্রুটির দিকগুলিও একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, ব্রহ্মচর্যাশ্রম আর বিশ্বভারতীর প্রাথমিক আদর্শেই অনেক ফারাক আছে একথ সবার জানা। সে বিষয় নিয়েই শুরু করা যাক। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে ছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা তপোবন আদর্শ প্রতিষ্ঠার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনাতেও কি ধর্ম বিষয়ে দুর্বলতা ছিল না, "... ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না।" (চিঠিপত্র ৬ সং- ১৬ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে ১৯০১ জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা।) মোটামুটি এই একই সময়ে 'ত্রিপুরার মহারাজাকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখছেন-"ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি।...আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।"[১] তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথায় ফিরে যেতে চাইছেন? তা না হলে কেনও ব্রহ্মচর্যাশ্রম তৈরির ভাবনা চিন্তার সময় বারবার এই ধরণের নেতিবাচক কথা বলছেন ? আসলে এই সময় তিনি প্রাচীন ভারতের 'তপোবন' ভাবনায় মগ্ন। তাই বারবার তাঁর মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের আসল প্রাণের সন্ধান পেতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে অরন্য সংসারে। যেখানকার "নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে সেই অরণ্যবাস নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত

করে দিয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত তাঁর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।"[২] ভারতবর্ষের সভ্যতার এই ফল্গুধারাকে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্য দিয়ে আবার প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন। তাই জগদীশচন্দ্র বসুকে আবার কয়েকদিন বাদেই লিখেছেন-"গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।" অর্থাৎ 'ভারতবর্ষে আদর্শ' আর 'হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথা' তাঁর কাছে প্রায় সমতুল্য, তবে তা ক্ষুদ্রার্থে নয় বৃহৎ ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে আবারও চিন্তা ভাবনায় গণ্ডগোল বাঁধে যখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় আশ্রমে পংক্তি বিভাজনে জাতপাতের ভিত্তিতে খেতে বসানো হত। ব্রাহ্মণ না হয়ে কায়স্থ হবার জন্য কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয় কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে নিষেধ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সঠিক পরিকল্পনার অভাব ও নিয়মের শৈথিল্যের জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম চালানো একসময় অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সব সময় কঠোর নিয়মের বিরোধিতা করে এসেছেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনার সময় তাঁকেই মনোরঞ্জনবাবুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "কঠিন নিয়মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাহা আমি সঙ্গত বোধ করি।" তৃতীয়ত, সবচেয়ে সমস্যা হল যখন শিক্ষকেরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নিজের গ্রহণ যোগ্যতা বাড়াবার জন্য শিক্ষকতা ছেড়ে সেই দিকেই বেশি মনোযোগ দিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে থেকে প্রায় সকলেই বুঝলেন তিনি কেবল বড় মাপের মানুষ নন, খুব বেশি ভালো মানুষও। ফলে তাঁকে সহজেই অর্থ কষ্টের মুখে পড়তে হবে। প্রথম দিকে এই কারণেই অনেকে ছেড়ে চলে যান। এরমধ্যে আবার ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একেবারে অথই জলে পড়লেন। ছ'মাসের মধ্যেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ল। তিনি ভেবেছিলেন প্রাচীন ভারতের আদর্শে আশ্রম বানালে ধনী হিন্দুরা

অর্থ দান করবেন, কিন্তু সেরকম কোনও লক্ষণ না দেখে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের আপোষ করতেই হল। ঠিক হল ছাত্রদের থেকে মাসতাকা তেরো টাকা করে বেতন নেওয়া হবে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অনেক সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে গেল যখন শিক্ষা ভাবনা নিয়ে তাঁর মতামতই অনেক বদলে গেল। শান্তিনিকেতনের এই পর্বে তিনি অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তা লাভ করলেন।

বিশ্বভারতী পর্বের সূচনায় যাঁর অনেকখানি অবদান ছিল, শান্তিনিকেতনকে যিনি ঐকান্তিক ভাবে ভালোবেসে ছিলেন। সেই বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কেও তাঁর এমন ভালোবাসার ক্ষেত্রে থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল। কারণ হিসাবে তিনি সকলকে বলেছিলেন 'কবি কে আর্থিক উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেবার জন্যই তাঁর শান্তিনিকেতন ত্যাগ।' কিন্তু তাঁর একথাগুলি গুরুদেবের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার বিনীত নিবেদন মাত্র। আসল কারণ তিনি কাউকে জানতে দিতে চাননি, পাছে শান্তিনিকেতনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে কষ্ট পান। ১৩৫৭ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ আয়োজিত অর্ঘ্য দান সভায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ভাষণে বলেন-"শান্তিনিকেতন ছাড়া আমি, আর আমা ছাড়া শান্তিনিকেতন, এ ছিল স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত।...কিন্তু বিধাতার তা সইল না। দৈবের কি দুর্বিপাক।...যা কখনো মনে হয়নি, আমার কপালে তাই ঘটল।...হায়। আমার ৩০ বৎসরের সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই চূর্ণ – বিচূর্ণ হয়ে গেল। কী ছিল, কী হল ! আমার বুকের পাঁজর ভেঙে গেল। গুরুদেবকেও প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হল। তারপর এক আপরাহ্নে দেখি উদয়নের কোণার্কের মধ্যে কেবল গুরুদেব ও আমি। আমি গুরুদেবের পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি।...গুরুদেব স্নিগ্ধ গম্ভীর ও মৃদু করুণ কণ্ঠে বললেন, 'উঠুন, আপনাকে আবার আসতে হবে।"[৩] বিশ্বভারতীর সঙ্গে শারীরিক

ভাবে বিচ্ছেদ হলেও আত্মিক বন্ধন তাঁর কোনোদিনই ছিন্ন হয়নি। নানান মতবিরোধ ও সমস্যার কারণে তাঁকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হয়। সে জন্য তাঁর মনে কোনও দুঃখ, অভিমান বা তিক্ততা ছিল না। বরং জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁর ছিল নির্মল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। 'তিনি আমাকে কত ভালোবাসতেন। ভালোবেসে তিনি আমাকে কতদিকে কত কী দিয়েছেন, তাঁর সীমা-পরিসীমা নাই। কিন্তু আমার ক্ষুদ্রতা ও আযোগ্যতায় তার কতটুকুই বা নিতে পেরেছি।...তিনি আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন যা পেয়ে আমি সমগ্র দিনের কর্মের অবসানে রাত্রিতে বেণুকুঞ্জের সমস্ত দরজা–জানলা খুলে দিয়ে শয়নের সময় মনে করতাম, আমি রাজার হালে আছি, আমি রাজার মতো খাই, রাজার মতো পরি, রাজার মতো ঘুমাই।'[৪] বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভালোবাসার প্রলেপ তাঁর মনোকষ্টে অনেক কমিয়ে দিয়েছে। তাই শান্তিনিকেতনে স্মৃতি তাঁর কাছে এখন মধুর হয়েই আছে।

লীলা মজুমদার 'পাকদণ্ডী'তে বিশ্বভারতীর এমনই কিছু সংকীর্ণতার দিক তুলে ধরেছেন। তিনি দেখেছেন শান্তিনিকেতনের পরিবেশে যতই স্বাধীনতা থাকুক একটা পরনিন্দা চর্চার আবহাওয়া তা একটু হলেও কলুষিত করত। একবার তিনি বার-তের বছরের ছেলে মেয়েদের নিয়ে পিকনিক করতে গেলেন, সারাদিন আনন্দে কাটল। কিন্তু সে কথা পরের দিন কবির কাছে বিকৃত ভাবে পৌঁছল। তিনি ব্যঙ্গার্থে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা নাকি কাল মিকসড বেদিং করে এসেছিলে?' সব আনন্দ এক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল। লীলা মজুমদারকে এই সব আপাত ক্ষুদ্র কারণের জন্য কবি মন খারাপ করতে বারন করতেন, বলতেন "ওরা বলেছে বলে কি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়েছে?...ছোট মুখের ছোট কথায় কান দিও না। আমাকেও তো কত কি বলে। চিরকাল বলেছে।"[৫] তাঁর কথা শুনে লীলা মজুমদারের সব রাগ ঠান্ডা হয়ে যেত। তাছাড়া

বিশ্বভারতীর মধ্যে তিনি একসঙ্গে এত ভালোমানুষের সঙ্গ লাভ করেছিলেন যে সেই বৃহতের মাঝে এই ক্ষুদ্র কথার রেশ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। "ব্যক্তিগত আক্রোশ, কিম্বা একটা ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, নিজের সুবিধা করে নেবার চেষ্টা—এসব হবেই। কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ এতটুকু ম্লান হয় না। ...একটু যত্ন পেলেই যা ছিল মরুভূমি, তা হয়ে ওঠে তপোবন।"[৬]

এই শেষের অংশে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হল শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথে যে কাজ চলেছিল, তা আজ সারা দেশের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের মূল ভিত্তি। কিন্তু তা যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই মস্তিষ্ক প্রসূত তা অনেকেই জানেন না। সেসময় 'স্বাস্থ্য সমিতির' উদ্যোগে সচেতনতা বেড়েছিল, গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের সন্তানদের হাতেকলমে কুটির শিল্পের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর হবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কৃষি, খামার-বাগিচা চাষে নানা পরীক্ষা মূলক উদ্যোগে কখন লাভ কখন ক্ষতি হয়েছিল সে কথা অনেকেরই জানা আছে। তাছাড়া ব্রতী বালকদল ও তাদের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে গ্রামে কত উন্নতি হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবিতাবস্থাতেই পল্লী উন্নয়নের এই কাজে ছেদ পড়তে থাকে সঠিক মানুষের হাল ধরার অভাবে। তবু এ কথা অবশ্যই মানতে হবে বর্তমানে তাঁর পল্লী পুনর্গঠনের কাজ কেবল শান্তিনিকেতনের পরিধিতে আবদ্ধ নেই, সরকারী নানা প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়ে তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এ কথা আজ আর কেউ খোঁজ রাখে না যে একটা সময় খুব অর্থ কষ্টের দিনেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকজন সুহৃদকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনের চারপাশের ছোট্ট পরিধির মাঝে একটি স্বনির্ভরতার জগৎ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। প্রগতিশীল ভারত গঠনের যে আদর্শ একদিন তিনি বোলপুরের নির্জন প্রান্তরে

শুরু করেছিলেন, সেই প্রকল্পগুলিই আজ সরকারী সাহায্যে নূতন নাম দিয়ে চলছে, বেশিরভাগই গান্ধীজীর নাম দিয়ে। অথচ তার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লী উন্নয়নের কাজে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন ও সাফল্য পেয়েছিলেন সে আজ সকলেই বিস্মৃত হয়েছেন। সামাজিক ভাবে উন্নতি যেমন দরকার, জীবনচর্যায় তেমনি শৈল্পিক বৃত্তি থাকা প্রয়োজন বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন। তাই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কাজের মধ্যেও তিনি সে ভাবকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

কথায় বলে শুভ কাজের উদ্যোগ নিলে তা যেমন করেই হোক পূর্ণ হয়, কেবল সদিচ্ছা ও মজবুত সংকল্প চাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা সত্যি করে দেখিয়েছেন। প্রায় সহায়-সম্বলহীন ভাবে শুধুমাত্র জ্ঞানের আদর্শকে আনুসরণ করার জন্য নিজের প্রাপ্য মাসিক ভাতার উপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি তৈরি করেছিলেন, নিজের আত্মীয়রাও যে কাজকে নির্বুদ্ধিতার নামান্তর ভেবেছিলেন। নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেও কেবল তাঁর সদিচ্ছা ও মজবুত সংকল্পের জোরেই সে প্রতিষ্ঠান বারবার সব বাধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। বেশীরভাগ সময়ই সমাধান এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে হয়েছে যেন তা দৈবের দান। আর এ কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আরাধ্য জীবন দেবতার উপর আমৃত্যু বিশ্বাস রাখতে পেরেছিলেন এবং সে বিশ্বাস মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমে, মানুষকে জীবন ধর্ম শিক্ষা দেবার উদ্দ্যেশে প্রয়োগ করেছিলেন।

----------তথ্যসূত্র----------

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী" দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭, পৃ ৩৫

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা', বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রন ভাদ্র ১৪১৭, আশ্রমের শিক্ষা, পৃ ৭৯

৩. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা, আনন্দ, ২০০৭, পৃ ৫৫৫

৪. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা, আনন্দ, ২০০৭, পৃ ৫৫৬

৫. লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ২৪০

৬. লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৩৯

গ্রন্থপঞ্জি

- অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। *শান্তিনিকেতনের স্মৃতি ও শান্তিনিকেতনের কথা* । কলকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক, ১৯৫০।
- অজিতকুমার চক্রবর্তী। *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর* । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আকাদেমি সং-২০১৩।
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । *ঘরোয়া* । রাণী চন্দ (অনুলিখিত) । কলকাতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭।
- অমিতা সেন । *শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা* । কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৭।
- অসিতকুমার হালদার । *করবিতীর্থে* । কলকাতা, পাইওনিয়র, ১৯৬৫।
- উইলিয়াম পিয়ারসন। *শান্তিনিকেতন* । অনুবাদ অমিয়কুমার সেন। বিশ্বভারতী, কলকাতা
- কালীপদ রায় । *শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ* । কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৭ ই পৌষ ১৩৬৫।
- টুকটুক রায়। *আশ্রমিক বীরেন্দ্রমোহন* । শান্তিনিকেতন, সুবর্ণরেখা, ২০০২।
- তপনকুমার সোম। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন* । কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১০।
- দিনকর কৌশিক। *শান্তিনিকেতনের দিনগুলি* । পত্রলেখা, কলকাতা, আগস্ট ২০০৯।
- নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ* । বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৫০।
- নন্দিনী দেবী । *পিতা-পুত্রী* । কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৮৪।
- পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় । *রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ* । কলকাতা, আনন্দ, ২০০৭।
- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। *রবীন্দ্রজীবনী* । দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত সং পৌষ ১৩৬৭।
- প্রমথনাথ বিশী । *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন* । কলকাতা, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৩৯৩।

- মহাশ্বেতা দেবী । *আমাদের শান্তিনিকেতন* । কলকাতা, সৃষ্টি প্রকাশনী, ২০০১।
- রাণী চন্দ । *আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ* । কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪১৮।
- রাণী চন্দ । *গুরুদেব* । কলকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮।
- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *পিতৃস্মৃতি* । কলকাতা, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ* । সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *বিশ্বভারতী* । সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *চিঠিপত্র* । ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । *শিক্ষা* । কলকাতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭ ।
- লীলা মজুমদার । *পাকদণ্ডী* । কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স ।
- শান্তিদেব ঘোষ। *জীবনের ধ্রুবতারা* । কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২২ শ্রাবণ ১৪০৩।
- শিশিরকুমার ঘোষ । *আমার পাওয়া শান্তিনিকেতন* । কলকাতা, প্রকাশনী, ১৯৬২।
- সুধীররঞ্জন দাস । *আমাদের শান্তিনিকেতন* । কলকাতা, বিশ্বভারতী , আশ্বিন ১৩৬৬।
- সুধীরচন্দ্র কর, সাধনা কর। *শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ* । কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।
- সৈয়দ মুজতবা আলী । *গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন* । কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ , ২০১৭।
- হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। *শান্তিনিকেতনের এক যুগ*। বিশ্বভারতী, কলকাতা, সং ১৩৮৭।
- ক্ষিতিমোহন সেন । *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন* । প্রণতি মুখোপাধ্যায় (সম্পা)। কলকাতা, পুনশ্চ, মে ২০১০।